সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র
চতুর্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ›› ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ›› পাঁচ টাকা

যারা দিল সবই, পেল না কিছুই

ভোর সাড়ে ৪টা। পাখিরা তখনো জেগে ওঠেনি। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে সাবিনাকে বিছানা ছাড়তে হলো। দ্রুত রান্না ও গোসল সারতে হবে। ৪ রুমের ২৪ জনের জন্য একটি টয়লেট ও দুটি চুলা। যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। দেড়-দুই কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে কারখানায় পৌঁছুতে হবে। তারপর চলবে দম বন্ধ করা আবেগ-অনুভূতিহীন রোবটের মত বার-চৌদ্দ ঘন্টার অমানুষিক খাটুনি। রাত ৯টায় নিঃশেষিত দেহে বাসায় ফেরা। যেখানে আলো- বাতাসের প্রবেশ নিষেধ, তবু ছয় জনের গাদাগাদি করে রাত্রিযাপন। অধিকাংশ রাতে খাবার *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলার রায় প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) 'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার সাজা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত প্রতিক্রিয়া প্রদান করেছেন – "নিজেরা স্বৈরতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন চালিয়ে অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার যখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দুর্নীতির বিচারে অতি তৎপর হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ জাগে। সম্প্রতি বিচারবিভাগের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ যেভাবে পাকাপোক্ত করা হয়েছে তাতে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়েছে। ৫ জানুয়ারি ২০১৪-এর মতো আরেকটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন প্রহসনের নির্বাচন করতে সরকারের রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই রায় ব্যবহৃত হবে – তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।"

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, "বিএনপি আমলসহ প্রত্যেকটি সরকারের সময়েই শীর্ষ মহলের সংশ্লিষ্টতায় দুর্নীতি ও লুটপাট হয়েছে – এ কথা মানুষ অভিজ্ঞতা থেকেই বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগ সরকারের গত ৯ বছরের শাসনামলে দলীয় লোকদের সংশ্লিষ্টতায় ব্যাংক-শেয়ারবাজার লুট, অর্থ পাচার, বিদ্যুৎ খাতসহ বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। এসম্পর্কে ওঠা অভিযোগগুলোর কোনোটিরই সুষ্ঠু তদন্ত-বিচার-শাস্তি হয়নি, বরং অপরাধীদের প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। সরকারের সহযোগী হওয়ায় মহাদুর্নীতিবাজ এরশাদের মামলাগুলোরও কোনো অগ্রগতি নেই। ফলে, দুর্নীতিবাজদের বিচারে সরকার আন্তরিক – এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শেখ হাসিনার নামে দায়েরকৃত মামলাগুলো প্রত্যাহার করে খালেদা জিয়ার মামলা চালানোর ঘটনাতেই সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও নৈতিক অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায়।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, "বর্তমান যুগে বুর্জোয়া ব্যবস্থা আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত। শাসকগোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার অবসান প্রকৃতপক্ষে এরা কেউই চায় না। ফলে আজ একদিকে দুর্নীতিবাজ বুর্জোয়া দলগুলোকে প্রত্যাখান করা দরকার, অন্যদিকে বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করে দমনমূলক ফ্যাসিবাদী শাসন দীর্ঘায়িত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন।"

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন
প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করার কৌশল

দেশটা যে ভালো চলছে না তা সবাই জানে। কিন্তু কতটা খারাপ, তার সীমা-পরিসীমা কত, তা বোধহয় ঠাওর করা যাচ্ছে না। একটি ঘটনা ছাপিয়ে যাচ্ছে আগেরটিকে। মাত্রা বাড়ছে ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার। অসংখ্য সংকটে জেরবার জীবনে ঠাঁই পাচ্ছে নিত্যনতুন মারপ্যাঁচ। শোষণের যেমন নিত্যনতুন কৌশল তেমনি তাকে আড়াল করারও নানা ছলাকলা আসছে প্রতিনিয়ত। আগে অন্যায় হলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করার সুযোগ থাকত। এখন তারও পথ কীভাবে সবদিক থেকে বন্ধ করা যায়, সে চেষ্টা চলছে। কূটকৌশলের নব্য সংযোজন ঘটছে প্রতিনিয়ত। পরিস্থিতি এখন এমন – অন্যায় হবে বেশুমার, সর্বত্র, কিন্তু প্রতিবাদ করলে থাকবে শাস্তি। এ যেন শ্বাসরোধ করে বাঁচিয়ে রাখার কৌশল।

আলোচনার কারণ সম্প্রতি দেশের মন্ত্রিপরিষদ একটি নতুন আইনের খসড়া 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' পাশ করেছে। ডিজিটাল শব্দটি গত কয়েক বছরে *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

একের পর এক প্রশ্নফাঁস
এ জাতির ভবিষ্যৎ কোথায়?

পরীক্ষা কেমন হবে তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের এখন ততটা ভয় বা উৎকণ্ঠা কাজ করে না, যতটা করে পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র পাওয়া নিয়ে। শিক্ষাব্যবস্থায় এখন এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। দেশের কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের এমনই হাল বানিয়ে ছেড়েছেন দেশের কর্তাব্যক্তিরা। প্রশ্নফাঁস এখন খুব সাধারণ ঘটনা। রীতিমত ঘোষণা দিয়ে প্রশ্নফাঁস করা হচ্ছে। এবারের এসএসসি পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ে এমনটি ঘটছে। পরীক্ষার সময় ফেসবুক বন্ধ করে দেয়া কিংবা হোতাদের ধরিয়ে দিতে পারলে ৫ লাখ টাকা জরিমানা দেবার ঘোষণা – এ সবই খুব হাস্যকর আর বালখিল্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ তাই দাবি তুলেছেন – বছরের শুরুতেই প্রশ্নপত্র দিয়ে দেয়া হোক! তাহলে কষ্ট করে বেশি পড়ার প্রয়োজন হবে না। সরকারের যেটা দেখানো প্রয়োজন- পাশের হার বৃদ্ধি কিংবা হাজার হাজার 'এ প্লাস' তা আরও সহজে করা সম্ভব হবে। *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নিপীড়ন
বিশ্ববিদ্যালয় এ কেমন ছাত্র-শিক্ষকের জন্ম দিচ্ছে?

গত ২৩ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে গেল এক বর্বরোচিত হামলাযজ্ঞ। ছাত্রী নিপীড়ন ও সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের ভিসি কার্যালয় ঘেরাওকালে ছাত্রলীগ এ হামলা চালায়। এর প্রতিবাদে গত ২৯ জানুয়ারি সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ঘটনাটিকে আড়াল করার জন্য বিভিন্ন মিডিয়ায় কতিপয় ব্যক্তিবর্গ বিভ্রান্তিকর নানা কথা বলছেন। সে ব্যাপারগুলোতে আলোকপাত করার আগে আসলে কী ঘটেছিল তা আগে আমরা একবার দেখে নেই।

ঘটনার পূর্বাপর

৭ কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে গত ১১ জানুয়ারি সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র কর্মসূচি পালন করে। ১৫ জানুয়ারি সাধারণ ছাত্ররা যখন তাদের দাবি জানাতে উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয় তখন প্রক্টর ও প্রশাসনের নির্দেশে শিক্ষার্থীদের হুমকি প্রদান ও মারধর করা হয়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নেতা মশিউর সাদিককে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা উপাচার্য কার্যালয়ের *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কৈশোরের সারল্য লুটে নিচ্ছে কারা?

সময়ের সাথে সাথে পাল্টাচ্ছে পত্রিকার খবর। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় একদিকে উন্নয়নের সংবাদ আসে, আরেক দিকে থাকে গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জমি নিয়ে কলহ, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজির বীভৎস আতঙ্ক। সেই সাথে ইদানিং কিশোর হত্যাকাণ্ডের কিছু ধারাবাহিক ঘটনায় ভীড় বাড়াচ্ছে অজানা এক বিভীষিকার। এমন হত্যাকাণ্ড একদিনে তৈরি হওয়া কোনো পরিস্থিতি নয়। হঠাৎ করে এই রকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

কিশোর বয়স, যে বয়সে শিরা টান করে বাঁচবার স্বপ্ন দেখার কথা, যে বয়সে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসা-বন্ধুত্ব-মমতা তৈরি হবার কথা, সেই বয়সে তারা জড়িয়ে পড়ছে বিদ্বেষে, জড়িয়ে পড়ছে নানা ধরনের অপরাধে। গত কিছুদিনে ঘটেছে তেমন কিছু ঘটনা। গত ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় উত্তরার ১৩ নম্বর *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন : প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করার কৌশল

(১ম পৃষ্ঠার পর) দেশের মানুষের কাছে খুব পরিচিতি পেয়েছে। সরকারের তথাকথিত ডিজিটাল উন্নতির সুফল সাধারণ মানুষ কতটা পাচ্ছে সে আলোচনায় না গেলেও বলা যায় – এক ভয়ংকর বিপদের দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি। মূল আলোচনার আগে শুধু একটি কথা বলে নেয়া ভালো – নিরাপত্তার কথা বলা হলেও এই আইন এক ভয়াবহ নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির দিকে দেশের সাধারণ মানুষকে নিয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে আইনটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনার অবশ্য কারণ আছে। কেননা এই আইনটি যার ধারাবাহিকতায় এসেছে সেটি হচ্ছে 'তথ্য প্রযুক্তি আইন' বা আইসিটি অ্যাক্ট। যার ৫৭ ধারার কুপ্রভাব দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সকলে টের পেয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে গত ২০১২ থেকে ২০১৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত তথ্য প্রযুক্তি আইনে ১ হাজার ৪১৭টি মামলা হয়েছে। যার ৬৫ শতাংশ হয়েছে ৫৭ ধারায়। সমাজের প্রতিটি বিবেকবান সচেতন মানুষ এই আইনটি বাতিলের দাবি তুলেছেন। দাবির প্রেক্ষিতে তথ্যমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী বলেছিলেন ৫৭ ধারা বাতিল হবে। নতুন একটি আইন আসবে। আইনমন্ত্রী নিজেও বলেছেন, '৫৭ ধারার মধ্যে অনেক অগণতান্ত্রিক বিষয় আছে। এগুলোর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।' আইনে পরিবর্তন এলো, কিন্তু যা হলো তা আগের চেয়েও হয়রানিমূলক এবং নিবর্তনমূলক।

'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন'র পূর্ণাঙ্গরূপ এখনও সরকারের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়নি। কেবল মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কথাতে এই আইনের কিছু অংশ প্রকাশ পেয়েছে। তাতেই বোঝা গেছে কতটা ভয়ংকর হতে যাচ্ছে এই আইন! দেখা যাচ্ছে ৫৭ ধারা তো বাতিল হয়নি, বরং এ ধারাটিকে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন'র বিভিন্ন ধারায় (২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১) ভাগ করে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়। নতুন করে ৩২ নম্বর ধারা যুক্ত করা হয়েছে। যেটা আসলে গোঁদের উপর বিষ ফোড়ার মতো। ৩২ নম্বর ধারার মূল কথা হলো – অনুমোদন ব্যতিরেকে সরকারি তথ্য সংগ্রহ করলে তাকে গুপ্তচরবৃত্তি বলে বিবেচনা করা হতে পারে। এই ধারা কার্যকর হলে দেশের সাংবাদিক মহল, গবেষক এমনকি সাধারণ মানুষ আর কোনোভাবে সরকারের দুর্নীতি-লুটপাটের খবর প্রকাশ করতে পারবে না।

প্রত্যেকটি আইনে যেমন থাকে, এখানেও কিছু গালভরা বুলি আওড়ানো হয়েছে। বলা হয়েছে এসব করা হয়েছে 'তথ্য সুরক্ষা'র জন্য। বলা হয়েছে – 'মানহানি' 'রাষ্ট্রের সুনামের ক্ষতি করলে', 'ধর্মীয় অনুভূতি'কে আঘাত করলে' মামলা করা যাবে। এসমস্ত কথা ৫৭ ধারাতেও ছিল। তার অপপ্রয়োগ আমরা দেখেছি।

যেকোনো একটি আইনের উদ্দেশ্য থাকা উচিত জনগণ যেন সেই আইনের ভাষা পড়ে বুঝতে পারে, সে যেন তার করণীয় কী, না করলে শাস্তি কী তা নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু এই আইনে 'মানহানি', 'রাষ্ট্রীয় সুনাম', 'ধর্মীয় অনুভূতি' ইত্যাদি শব্দগুলির কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। একই অবস্থা যখন ৫৭ ধারাতেও ছিল তখনও এই শব্দগুলোর নিজের মতো ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষমতাসীনরা একের পর এক অপকর্ম ঘটিয়েছে। যেমন- কী করলে মানহানি হবে তা এই আইনে অস্পষ্ট। তাহলে কোনো ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমালোচনা করলেও তো মানহানি হতে পারে। জনগণকে না জানিয়ে যখন একের পর এক দেশবিরোধী চুক্তি হয়, তার প্রতিবাদ করলে তো 'রাষ্ট্রের সুনামের ক্ষতি' হতে পারে। শুধু তাই নয়, এই আইনে 'সংক্ষুব্ধ' ব্যক্তি ছাড়াও 'মানহানি'র মামলা করতে পারবে যে কেউ। যেমন – যদি কোনো মন্ত্রী বা এমপি মনে করেন তার বিরুদ্ধে লিখিত বা প্রদানকৃত বক্তব্য তাকে হেয় করেছে তাহলে তিনি তো বটেই বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন। এর ফল কী হতে পারে তা আমরা কিছুদিন আগেও 'ডেইলি স্টার' পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনামের একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দেখলাম। সারাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা করা হলো। প্রায় শত কোটি টাকার মানহানির মামলা হলো। এতে এখনও হয়ত ওই সম্পাদককে জেলে যেতে হয়নি। কিন্তু এত এত মামলা একজন মানুষকে হয়রানির জন্য যথেষ্ট। দেশের শীর্ষস্থানীয় একজন ব্যক্তির যখন এমন দশা হয় তখন সাধারণ মানুষের কী হবে? এমন জাতের হয়রানি করার সুযোগ ওই আইনে থাকছে।

খসড়া আইনের ২১ ধারায় বলা হয়েছে 'ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা জাতির পিতার নামে প্রোপাগান্ডা বা প্রচারণা চালালে বা মদদ দিলে অনধিক ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা ১ কোটি টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।' এখন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বলতে আমরা কী বুঝব তা কি কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? আমরা তো নিত্যদিন দেখছি সরকার তার যত অপকর্ম আছে সবই করছে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' কথা বলে। কিন্তু সরকারের বয়ানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি সত্যিকারের চেতনা? মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে তো সমতার কথা বলা, সমাজে বৈষম্য দূর করা, লুটপাট বন্ধ করা, দেশের সম্পদ পাচার হতে না দেয়া, সাম্প্রদায়িক-জাতিগত নিপীড়ন বন্ধ করা, সন্ত্রাস-যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, সীমান্ত হত্যা বন্ধ করা, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা ইত্যাদি। কিন্তু এর কোনোটিই কি সরকার করছে? যদি না করে তাহলে তার প্রতিবাদ করা কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী হবে? আসলে সরকার প্রতিদিন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বলে যা করছে তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু এসব নিয়ে বলা যাবে না। চেতনা পরিপন্থী কাজ হবে।

এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত। এই লড়াই কোনো একক ব্যক্তি বা কোনো একটি রাজনৈতিক দল করেনি। লাখ লাখ শহীদ যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। কিন্তু এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা ভেবে আজ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়নি। এখনও এর সকল গৌরব একক ব্যক্তি বা দলের কানাগলিতেই সীমাবদ্ধ আছে। বাঙালি জাতির এই মহান সংগ্রাম নিয়ে তাই আরও বেশি করে গবেষণা-আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ঐতিহাসিক কালপঞ্জি সংগ্রহ করা এবং তা নিয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু যে আইন আজ বলবৎ হতে যাচ্ছে, তাতে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ কাজ কোনো গবেষক, কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করা সম্ভব হবে না। কেননা তাতে নেমে আসবে সরকারি নিষেধাজ্ঞার খড়্গ। কেবল এবং একমাত্র আওয়ামী লীগ এবং তার সরকার যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাখ্যা করবে সেভাবেই দেশের সকল মানুষকে তা মেনে নিতে হবে। জাতির এতবড় অর্জনকে এভাবে দলীয় সম্পত্তিতে কুক্ষিগত করার আয়োজন চলছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগলে' মামলা করার বিধান রাখা হয়েছে। এমন বিধান তথ্যপ্রযুক্তি আইনেও ছিল। কিন্তু ঘটনা ঘটেছে কী? 'ধর্মীয় অনুভূতি' বলে যা বোঝানো হয়েছে তা আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণেরই অনুভূতি। সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করলেও তাতে ধর্মীয় অনুভূতি আহত হয়নি। এই সময় ফেসবুকের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হয়েছে। দেখা গেছে ঘটনাগুলো পরিকল্পিত, জায়গা-জমি-সম্পত্তি-সম্পদ লুটপাট করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সবগুলো ঘটনার সাথে সরকারের লোকজন সম্পৃক্ত ছিল। যেমন কক্সবাজারের রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে, রংপুরের ঠাকুরপাড়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। যাদের বিরুদ্ধে উস্কানির অভিযোগ আনা হয়েছে, তারা প্রত্যেকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর এবং তারা কেউই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে জানে না। এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে আসলে তাদের পরিবার পরিজন এমনকি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ একটি ঘটনাতেও কারা প্রকৃত অপরাধী তা প্রকাশ করা হয়নি।

খসড়া আইনে নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে ৩২ নম্বর ধারা। এতে বলা হয়েছে, 'সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ কোনো সংস্থার গোপনীয় বা অতিগোপনীয় তথ্য-উপাত্ত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেউ ধারণ করলে তা হবে ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির শামিল। শাস্তি প্রথমবারের অপরাধে ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা ২৫ লাখ টাকা জরিমানা, দ্বিতীয়বার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এক কোটি টাকা জরিমানা।' এই আইনটি কার্যকর হলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বা গবেষণা বলে কিছু থাকবে না। ব্যাপারটি এমন – কেবল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির অনুমতি পেলেই কোনো তথ্য-গবেষণা প্রকাশ করা যাবে। যেন কোনো মন্ত্রী-এমপি-সরকারি আমলা বা যেকোন সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যার বিরুদ্ধে দুর্নীতি-লুটপাট বা যেকোনো ধরনের অপরাধের অভিযোগ উঠেছে, তিনি বা তারা যদি অনুমতি দেন একমাত্র তখনই কেবল তা প্রকাশ করা যাবে। এর মতো অগণতান্ত্রিক ও কালো আইন কি আর হতে পারে?

আসলে এমন বিধান করার পিছনে সরকারের উদ্দেশ্য আছে। আগে তথ্যপ্রযুক্তি আইন করা হয়েছিল সরকারের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি যেমন প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা, প্রধানমন্ত্রীর নিকট আত্মীয় এদের রক্ষা করার জন্য। এবারের আইনটিতে এর পরিধিটিকে আরও বিস্তৃত করে প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গকে যুক্ত করা হয়েছে। সরকারের বেশুমার লুটপাট তো কেবল শীর্ষে বসে থাকা ব্যক্তিবর্গ করে না, এর সাথে যুক্ত আরও অনেকেই থাকে। তাদের সুরক্ষা দেবার জন্যই আসলে এই আইন। তাই বলা যায়, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আসলে দুর্নীতিবাজ ও লুটপাটকারীদেরই আরও নিরাপত্তা দেবে।

পরিশেষে বলতে হয়, দেশের বিচারব্যবস্থা যখন সর্বোতভাবে দেশের আইনবিভাগের উপর নির্ভরশীল, বিচারব্যবস্থা যেখানে ন্যূনতম নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছে না, যে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র বলে কোনো কিছু আজও গড়েই ওঠেনি, যেখানে শাসনব্যবস্থায় জবাবদিহিমূলক কোনো রীতি-নীতি নেই সেখানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কেবল ক্ষমতাসীনদের আরও বেশি একক ক্ষমতাশালী করবে। সমাজে ক্ষমতাকাঠামো যখন এমন বিরাট পার্থক্য তৈরি হয়, তখন অনিবার্যভাবে তলার মানুষরা হয় সবচেয়ে বেশি নিষ্পেষিত, শোষিত। আজকের বাংলাদেশ তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তবে একটা ভুল সব শাসকরাই করে থাকে। তারা দমন-পীড়নের নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে আর ভাবে তাতে প্রতিবাদ বোধহয় বন্ধ হবে। কিন্তু এটাই সভ্যতার শিক্ষা – মানুষকে চিরদিন চুপ করে রাখা যায় না। চিন্তা করার শক্তিই তাকে পথ দেখায়। মানুষ তখন সংগঠিত হয়। বাঁচবার পথ খুঁজে নেয়। এই সত্য ইতিহাসে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

এ জাতির ভবিষ্যৎ কোথায়?

(১ম পৃষ্ঠার পর) এতদিন শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্নফাঁসের সকল ঘটনাকে অস্বীকার করেছিলেন। এমনকি গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার হুমকিও দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন উনি চাইলেও আর তা বলতে পারছেন না। কেননা প্রশ্নফাঁস যে প্রতিনিয়ত হচ্ছে – তা এখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রটিও জানে। পত্রিকা, টেলিভিশনে তো প্রতিদিনই আসছে প্রশ্নফাঁসের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার রমরমা ব্যবসার খবর। ফেসবুকের কিছু পেজ এর মাধ্যমে প্রশ্নফাঁসের খবর এখন ছাত্র-অভিভাবকদের মুখে মুখে। সবাই জানে কেবল পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন অপরাধীদের খুঁজে পাচ্ছে না। দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী চাইলে কী পারে – তা সবাই জানে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল কিংবা কোনো ফায়দা আদায় করতে হলে আইসিটি অ্যাক্টের ৫৭ ধারার ব্যবহার আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনৈক যুবক ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে অশালীন কিছু বলেছে বলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এতকিছু করা যায় কিন্তু জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিচ্ছে যে অপরাধ, শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে যে ঘটনা, তার সাথে জড়িতদের ধরতে পারা যাচ্ছে না। এ কি কোনো বিশ্বাসযোগ্য কথা?

একটি দেশে যখন দিনের পর দিন অপরাধের বিচার হয় না, সমাজের বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ যখন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে তখন অপরাধেরও একটা সামাজিকীকরণ ঘটে। প্রশ্নফাঁসের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই ঘটেছে। গত ৪ বছরেই ৬৫টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। একটিরও বিচার হয়নি। বিচার যখন হয় না তখন অভিভাবক-শিক্ষকরাও এখন থেকে যতটা সম্ভব সুবিধা নেবার চেষ্টা করে। রেজাল্টসর্বস্ব এই শিক্ষাব্যবস্থাও অভিভাবক-শিক্ষকদের ঠেলে দেয় প্রশ্নফাঁসের প্রলোভনে পা দিতে। এই অনিশ্চিত সমাজে ভবিষ্যত যখন কেবল ভালো রেজাল্ট আর ভালো উপার্জনের উপর নির্ভর করে, তখন অনৈতিকভাবেই পাশ করাটাও অনেকের কাছে জায়েজ হয়ে যায়। এতে করে কতিপয়ের ফলাফল ভালো হচ্ছে কিন্তু যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত অন্যায্য। এই প্রক্রিয়াতেই আজকের অবোধ-সরল শিশুটি আগামী দিনের ভয়ংকর ক্রিমিনাল হয়ে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা নিয়ে বড় হচ্ছে। আজকে তাই শিক্ষক-অভিভাবকদেরও ভাবতে হবে প্রশ্নফাঁসের মাধ্যমে ভালো ফলাফল করা সন্তানটির কোন ভবিষ্যৎ আপনি ডেকে আনছেন?

আমরা জানি, ব্যবসা মানেই মুনাফা। শিক্ষা যখন মুনাফার হাতিয়ার হয়ে যায়, তখন শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত সকলের মধ্যেই নীতিহীন মুনাফার মনোবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার যে চক্রান্ত চলছে তা থামানো না গেলে বিচ্ছিন্নভাবে প্রশ্নফাঁস রোধ করা যাবে না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি স্তরেই শিক্ষা যখন টাকার নিক্তিতে মাপতে হয় তখন সেখানে প্রশ্নপত্রও একটা কেনা-বেচার পণ্য। তাই অবিলম্বে সমাজের সকল বিবেকবান মানুষকে এই ভয়ংকর অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র কিনে নিজের সন্তানকে কোনোদিনই প্রকৃত অর্থে উচ্চশিক্ষিত ও বিবেকবান মানুষ করতে পারবেন না – এ সত্যও আজ অনুধাবন করা প্রয়োজন। সময় থাকতে প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামুন, নাহলে শিক্ষা-সংস্কৃতি-নৈতিকতাসহ সকল ক্ষেত্রে একটি ভঙ্গুর জাতি হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ খোলা থাকবে না।

ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা

আত্মসমর্পণে মুক্তি নেই

সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের গৌরব করবার মতো যে কয়টি বড় বিষয় আছে – তার একটি ভাষা আন্দোলন, অন্যটি মুক্তিযুদ্ধ। জাতীয় মুক্তির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ লড়াই করেছে, আমরাও লড়েছি। কিন্তু ভাষার লড়াই সারা পৃথিবীর মধ্যেই বিশেষ। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বিকাশধারায় ভাষার আন্দোলন চেতনাগতভাবে এক বিরাট উল্লম্ফন ঘটিয়েছে। '৪৭-এ ভারত বিভক্তির পর সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাব বিদ্যমান ছিল, ভাষা আন্দোলন তাকে পাল্টে দিয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে আরব-পারস্যের যে ঐতিহ্যবোধ কাজ করত, তার রূপান্তর ঘটিয়ে মুসলমানদের 'বাঙালী' পরিচয়কে মুখ্য করে তুলেছে, যে পরিচয়ের ভিত্তি ছিল ভাষা।

লড়তে লড়তেই মানুষের চেতনা পাল্টায়। ৫৬ ভাগ জনগোষ্ঠীর ভাষা অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা না হয়ে কেন উর্দু (যা পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের ভাষা ছিল না) রাষ্ট্র ভাষা হবে – এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠেছিল। তুলেছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সচেতন বুদ্ধিজীবীসমাজ। পাকিস্তানি শাসকরা ধর্মের মোড়কে কার্যকর করতে চেয়েছিল তাদের অধীনতা আরোপের অভিসন্ধি। ভাষাতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন, ইসলামের ভাষা বলে যে উর্দুকে হাজির করা হচ্ছে, তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ইসলাম-পূর্ব যুগে 'আরবি' পৌত্তলিকদের ভাষা ছিল।

পাকিস্তানের জনসংখ্যা গরিষ্ঠতার বিচারে (শতকরা ৫৬ ভাগ জনগোষ্ঠীর ভাষা) বাংলা ছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবিদার। শাসকদের এ অগণতান্ত্রিক-স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভাষার লড়াই ছিল তাই গণতান্ত্রিক লড়াই। এ গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশধারায় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানিরা বুঝেছিল, যেমন সমস্ত কর্তৃত্বপরায়ণ শাসকরা জানে, কেবল লাঠির জোরে জনগণকে অবদমিত করে রাখা যায় না – সেইজন্য সাংস্কৃতিকভাবে তাকে হীনম্মন্য প্রমাণ করতে হয়। ভাষা যেহেতু চিন্তার বাহন, তাই শাসকদের ভাষার কর্তৃত্ব তাদের রাজনৈতিক চিন্তার কর্তৃত্বও সৃষ্টি করবে স্বাভাবিকভাবেই। মুঘলযুগে যেভাবে ফারসি, ইংরেজ শাসনে এসে যেভাবে ইংরেজি চেপে ছিল, একইভাবে পাকিস্তানের কালে এসে উর্দু আরোপ করার চেষ্টা হয়েছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোহভঙ্গ নাহলেও নতুন রাষ্ট্রের চরিত্র শুরু থেকেই মানুষ কিছু কিছু বুঝতে শুরু করেছিল। শ্রমিক-কৃষক-শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে সোচ্চার হচ্ছিল। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা এমনই এক ঐক্যবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যা ছিল অভূতপূর্ব। শিক্ষিত মানুষের কাছে ভাষার উপর আক্রমণ এবং তার প্রভাব যতটা মূর্ত, সাধারণ মানুষের কাছে তা ছিল না স্বভাবতই। সাধারণ মানুষের যুক্ত হবার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে রাষ্ট্রের অন্তর্গত বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে। এভাবে গোটা জনপদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। সে জন্যই কথা এসেছে – 'একুশ মানে মাথা নত না করা।'

একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতেই গড়ে উঠেছিল শহীদ মিনার। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই স্মৃতিস্থানটি গণমানুষের মিলনমোহনায় পরিণত হয়েছিল। পুরান ঢাকার বউঝি'রা (যারা রক্ষণশীলতার মধ্যে বাস করত) প্রবল আবেগে শহীদ মিনারে ফুল দিতে ছুটে এসেছিল ধর্মীয় কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার শৃঙ্খল ভেঙে। এরপর থেকেই প্রতিবছর মেডিকেল কলেজের সামনে সে স্থানটিতে মানুষ একত্রিত হতো এবং পরবর্তীতে মওলানা ভাসানী একুশের ভোরে প্রভাতফেরী চালু করেছিলেন। পেছনের ইতিহাস ও স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ভোর থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে খালিপায়ে প্রভাতফেরী করে স্কুলের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ শামিল হতো। বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী হলেও শহীদ মিনারকে কেউ ধর্মীয় স্থান হিসেবে দেখেনি, দেখেছে লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে। এ কারণেই যত দুর্যোগ আমাদের জাতীয় জীবনে এসেছে, মানুষ ছুঁটে গিয়েছে শহীদ মিনারে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা নিতে। শহীদ মিনার ও প্রভাতফেরী কেবল দুটি অনুষঙ্গ নয়, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় মানুষের ঐক্যবদ্ধতার বাস্তব রূপ। পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াইয়ের পথ ধরে শাসকবর্গের সাম্প্রদায়িকতার সমস্ত চক্রান্তের জালছিন্ন হয় এ চেতনার উপর ভিত্তি করে (সমাজজুড়ে পরিপূর্ণভাবে প্রবিষ্ট না হলেও)। ভাষা আন্দোলনের চেতনা অন্য অর্থে তাই ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা।

ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস তৈরি হয়েছে। কথা ছিল বৈষম্য থাকবে না, শোষণ থাকবে না, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে। সর্বস্তরে মাতৃভাষায় পাঠদান হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বিলুপ্ত হয়ে একধারার শিক্ষা হবে। কিন্তু শাসননীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিবাদ। তাই ভূ-খণ্ড ও শাসক বদল হলেও নীতি বদলায়নি। শিক্ষার সর্বস্তরে বিশেষত উচ্চশিক্ষার স্তরে মাতৃভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন, বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় পুস্তক অনুবাদের জন্য বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এগুলো কোনো কঠিন কাজ ছিল না। যে মনোভাব নিয়ে মানুষ লড়েছিল, সে মনোভাব শাসকদের ছিল না বলেই তা হয়নি। তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা বহাল থেকেছে, যে কারণে সুস্পষ্ট শ্রেণিবিভাজন থেকে গেছে এবং দিন দিন তা আরো পুষ্ট হয়েছে। এখন ধনী পরিবারের সন্তানরা পড়ছে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল-কলেজে, দরিদ্ররা পড়ছে মাদ্রাসায়, নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের সন্তানরা পড়ছে সাধারণ স্কুল-কলেজে। যেহেতু ধনীরাই দেশ চালায়, সেহেতু তাদের চিন্তাচেতনা ও দক্ষতা তৈরির উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ইংরেজিমাধ্যম থেকেই ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি হবে, সেটাই স্বাভাবিক। এভাবে এলিট একদল মানুষ তৈরি করা হচ্ছে, যাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আকুতি বোঝার, তাদের স্বার্থানুগ হবার কোনো সাধ্যই থাকবে না। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার ধারা পুষ্ট হয়েছে, যা কার্যত আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনার সপক্ষে অবস্থান নিতে পারছে না। কার্যত ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধেই বিরাট মনস্তত্ত্ব তৈরি করেছে; যার ফলাফল আমরা দেখছি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার নানা ঘটনায়, সাম্প্রদায়িক নানা হামলায়। পাকিস্তানিদের যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল, ক্ষমতার প্রয়োজনে তাকেই পরিপুষ্ট করেছে বর্তমান ও অতীতের সরকারগুলো। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়াবলি পর্যন্ত পাল্টে দেওয়া হয়েছে গোঁড়া ধর্মীয়গোষ্ঠীর দাবির কাছে মাথা নুইয়ে। এদের কাছে একজন 'রবীন্দ্রনাথ' বা 'সুকান্ত' বড় সাহিত্যিক বা কবি নন, হিন্দু মাত্র। নতি স্বীকারের কারণ ও লক্ষ্য যে ভোটব্যাংক ও ক্ষমতা, তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। পাকিস্তান আমলে ধর্মের প্রবল ঘেরাটোপের মধ্যেও যে চেতনায় শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, প্রভাতফেরী চালু করা গিয়েছিল, আজ তার এই পরিণতি! অথচ এরাই আবার ফুল দেয়, শ্রদ্ধা জানায়, বইমেলার আয়োজন করে।

ভাষা আন্দোলন ছিল অন্য ভাষার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সাংস্কৃতিকভাবে আজ ইংরেজির প্রভুত্ব তৈরি হয়েছে। ইংরেজি না জানলে জীবনটাই যেন বৃথা–এরকম মনোভাব সর্বত্র। কথায়, উচ্চারণে ইংরেজি ও বাংলা মিশিয়ে বলা, ভঙ্গি করা – সাহেবিয়ানার সংস্কৃতির প্রকাশ যেন! ভোগবাদের বিস্তার যুবক-তরুণদের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার এক বিরাট বৃত্ত তৈরি করেছে। ভয়াবহভাবে বেড়েছে নারীনির্যাতন ও মাদকের বিস্তার। অর্থনৈতিক শোষণের তীব্রতা যত বাড়ছে, রাষ্ট্র হয়ে উঠছে তত কর্তৃত্বপরায়ণ। দুর্নীতি, লুটপাট, গুম, খুন, ধর্ষণ – কী নেই? ৪৭ বছরে গণতন্ত্রের কোনো বালাই-ই ছিল না। কখনো অনির্বাচিত, কখনো বা নির্বাচিত সামরিক-বেসামরিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা চেপেছে। শাসকদের আচরণে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি-মূল্যবোধ কোনোকিছুই যেন এখন আর অবশিষ্ট নেই। গায়ের জোরই যেন শেষ কথা। প্রতিবাদের সামান্য চেষ্টাও তীব্রভাবে দমন করা হচ্ছে। আজ দরিদ্র মানুষের কোনো ভাষা নেই, নীরব ক্রন্দন আর আর্তনাদ ছাড়া। আর নিরক্ষর যারা, তাদের তো ভাষাই নেই। রাষ্ট্রের ভাষা আজ আক্ষরিকভাবে বাংলা হলেও কার্যত বাংলা নেই। স্বৈরাচারের ভাষা জনগণের লড়াইয়ের বাংলা ভাষা নয়। কর্তৃত্বের ভাষা 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা' হতে পারে না।

তাহলে ভাষা আন্দোলনের আজকের তাৎপর্য কী হবে? কী হবে তার চেতনা? প্রকৃতপক্ষে চেতনা কোনো স্থির ব্যাপার নয়, চেতনা প্রবহমান। পথ যেমন থেমে থাকে না, অগ্রসর হয়; ভাষার লড়াইয়ের চেতনাও তেমনি অগ্রসরমান। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা শোষণমুক্তিরই চেতনা। তাই বিদ্যমান পুঁজিবাদী কাঠামোর পরিবর্তন ছাড়া বাংলাভাষার মুক্তি আসবে না।

একুশের সংস্কৃতি – মাথা নত না করা। এই চেতনা আজ সমাজজীবনে স্বল্প পরিসরে দৃশ্যমান। আমরা কি তাহলে হতাশ হব? আত্মসমর্পণ করব? যা চলছে, তার সঙ্গে মানিয়ে চলব? ভাষা আন্দোলন বলছে – আত্মসমর্পণে মুক্তি নেই। যত কঠিনই হোক, ব্যবস্থা পাল্টানোর সংগ্রাম আমাদের এগিয়ে নিতেই হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নিপীড়ন

(১ম পৃষ্ঠার পর) ভেতর নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে এবং দুইদিন তাকে অজ্ঞাতস্থানে আটকে রাখে। পরবর্তীতে জানা যায়, প্রশাসনের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাকে পুলিশ প্রশাসনের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়। ওইদিন ছাত্রীরা লাঞ্ছনার শিকার হোন। আন্দোলনরত একজন ছাত্রীর ভাষ্যমতে, 'সেইদিন ওরা (ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী) আমাদের সাথে যা করেছে তা আমাদের জন্য ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। পা দিয়ে পেছনে লাথি দেওয়া, সিগারেট খেয়ে ধোঁয়া ছুড়ে দেয়া, নোংরা কথা বলা আরও কত কী!'

এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ১৭ জানুয়ারি 'নিপীড়ন বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ'র ব্যানারে শিক্ষার্থীদের উপর নিপীড়ন ও ছাত্রীদের উপর লাঞ্ছনার প্রতিবাদে অপরাজেয় বাংলায় মানববন্ধন ও পরে প্রক্টর অফিসের সামনে অবস্থান নেয়া হয়। দেখা গেল, সেদিন কলাভবনের সামনের গেট বন্ধ করে রাখা হয়েছে (যা কখনই বন্ধ রাখা হয় না)। প্রশাসনের এ আচরণে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা গেট ভেঙে ফেলে। এসময় প্রক্টর চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি নিপীড়কদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অপারগতার কথা জানান। ওইদিন বিকেলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের কাছে তিন দফা দাবি জানায়। দাবিগুলো ছিল – নিপীড়নকারীদের সাময়িক বহিষ্কার, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৩ জন ছাত্র প্রতিনিধিসহ তদন্ত কমিটি গঠন ও ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করে নিপীড়কদের আজীবন বহিষ্কার এবং ব্যর্থ প্রক্টরের পদত্যাগ। কিন্তু দাবি পূরণ দূরে থাক, প্রক্টর ও প্রশাসন নিপীড়কদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিচার প্রার্থী অজ্ঞাতনামা ৫০/৬০ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করে। ৪৮ ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পরও প্রশাসন যখন নিপীড়কদের রক্ষা করতেই তৎপর, তখন বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ২৩ জানুয়ারি উপাচার্য কার্যালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা দেয়। ভিসি কার্যালয়ে সেদিন মূল চত্ত্বরের বাইরের গেট বন্ধ করে রাখা হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা উপাচার্যের সাথে দেখা করে তাদের দাবিপূরণের বিষয়ে জানতে চায়। কিন্তু উপাচার্য ছাত্রদের দাবি উপেক্ষা করে উপরন্তু ছাত্রলীগকে ডেকে এনে হামলার প্রেক্ষাপট তৈরি করেন। সেদিন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন হলের সহস্রাধিক নেতা-কর্মী লাঠি লোহার রড দিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। রেজিস্টার বিল্ডিংয়ের ভেতরে ও বাইরের গেটের সামনের অংশে প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী চলে হামলা ও নির্যাতন। এতে মারাত্মকভাবে আহত হন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ঢাবি শাখার সাবেক সভাপতি ইভা মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক প্রগতি বর্মণ তমা, সহ-সভাপতি সাদিকুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক লিটন নন্দী, ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি উম্মে হাবীবা বেনজীর, শিক্ষার্থী মাসুদ আল মাহাদী, আরশাদসহ প্রায় অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী ও শিক্ষাথী। ছাত্রলীগের নৃশংস হামলা থেকে সাংবাদিকরাও রেহাই পায়নি।

সুবিধাবাদের সাথে যুক্ত থেকে শিক্ষকরা চরিত্র হারিয়ে ফেলছেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কথা বললে শামসুজ্জোহার কথা মনে আসবে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ছিলেন। ঊনসত্তরের উত্তাল সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বাঁচাতে পুলিশকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেয়ায় গুলিতে প্রাণ হারান তিনি। জীবন দিয়ে জীবনের মর্যাদা রক্ষার এরকম আরো কত উদাহরণ আছে। স্বাধীন দেশে আজ প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বরত শিক্ষকদের ভিতর শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিভাবকসুলভ দায়িত্ববোধ কোথায়? এ দায়িত্ববোধ থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ম. আখতারুজ্জামানের পক্ষে কি সম্ভব ছিল ছাত্রদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে ছাত্রী লাঞ্ছনায় অভিযুক্ত ছাত্রলীগকে ডেকে আনা? ভিসি কি কোনো চেয়ার নাকি ছাত্রদের ভালো মন্দ দেখার সর্বোচ্চ দায়িত্ব? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রংপুর ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান

প্রত্যেক ঘরে একজন করে চাকুরি প্রদান, ৮০০ টাকায় প্রত্যেক পরিবারের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা, ১০ টাকায় ও.এম.এসের চাল দেওয়া, বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের সামনে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অবস্থান কর্মসূচি পালন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। এই লক্ষ্যে পাড়ায়-পাড়ায়, হাট-বাজারে, এলাকাভিত্তিক পথসভা, হাটসভা, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রচারণা চলছে।

চার ফসলি জমি ধ্বংস করে বিদ্যুৎ প্রকল্প চাই না

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেক্সিমকো পাওয়ার কোম্পানি এবং চীনের টিবিয়ে কোম্পানিকে কাজ দেওয়ার জন্য প্রায় ১০০০ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ৪ ফসলি জমি রক্ষায় সোচ্চার হয়েছে বাস্তুভিটা, আবাদী জমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটি।

আন্দোলনের চাপে লাঠশালার সব জমি অধিগ্রহণ করতে না পেরে কোম্পানি এখন হানা দিচ্ছে পাশ্ববর্তী এলাকা ঘোর্দাসহ অন্যান্য এলাকায়। জমি দখলেন নতুন কৌশল নিয়েছে দাম বাড়িয়ে দিয়ে। এলাকার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে জমি রক্ষায়। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি রংপুর বিভাগীয় কমিশনারকে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নিপীড়ন

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) বর্তমানে প্রবল- এটা যেমন সত্য, পাশাপাশি এ কথাও সত্য একদল শিক্ষক আছেন যারা ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। গণমানুষের যেকোনো অধিকারের প্রশ্নে এরা রাজপথে শামিল হোন। আশাবাদ এখানেই। প্রতিবাদের ছোট্ট কণ্ঠস্বরটিকে বড় করে তোলা ছাড়া আর কোনো পথ আছে কি? বেশিরভাগ শিক্ষার্থী যারা এ হামলাকে সমর্থন দেয়নি, আবার সক্রিয় অংশগ্রহণও করেনি, তাদেরও ভাবতে হবে ভীতসন্ত্রস্ত থেকে নিজের আত্মশক্তিকেই কি আমরা বিনাশ করছি না? দখলদার শক্তির কাছে আমাদের শিক্ষার পরিবেশ, জীবন, আত্মসম্মানবোধ সবকিছুকে বিকিয়ে দিচ্ছি না? আমাদের সংঘবদ্ধতা কতিপয়ের হাতে আমাদের বর্তমান জিম্মিদশাকে মুহূর্তেই পাল্টে দিতে পারে। আত্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সংগ্রামের ধারাটিকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে যেমন রক্ষা পাবে বিদ্যায়তন, একইভাবে রক্ষা পাবে মনুষ্যত্ব, ছাত্র-শিক্ষকদের চরিত্র।

দ্রব্যমূল্যের যাঁতাকলে পিষ্ট দেশবাসী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নামতে ২.৬ পর্যন্ত নেমেছিল। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার সাথে ঘন কুয়াশার কারণে দিনের পর দিন কাজ করতে পরেনি দিনমজুর, রিক্সা-ভ্যানচালক, কৃষি শ্রমিকসহ শ্রমজীবী মানুষ। শীত ও ঘন কুয়াশার প্রকোপে সবজি, বীজতলাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোথাও কোথাও। পরপর কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ১০/১২টি জেলার কয়েক কোটি মানুষ দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে। এ কারণেই বছর শেষে অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা।

তবে সরকারের মন্ত্রী ও সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের মতো অনেকেই হয়তো ভাবছেন বন্যা-শীতসহ এসব প্রাকৃতিক বিষয়, যার উপরে মানুষের হাত নেই। সরকারই বা কী করবে? কথাটা যে সত্য নয়, তা গণমাধ্যমগুলো হাওর দুর্যোগের সময় বার বার তুলে ধরেছে। কীভাবে বছরের পর বছর হাওরে অঞ্চলে বন্যা ঠেকানোর বাঁধগুলো সংস্কার না করে বরাদ্দকৃত শত শত কোটি টাকা লুটপাট করেছে সরকারদলীয় নেতাকর্মী ও তাদের মদদপুষ্ট ঠিকাদাররা। ত্রাণ বিতরণের নামে বিরামহীন লুটপাট ও অনিয়মের ভুরি ভুরি অভিযোগ ছিল সবখানেই। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে, অন্যদিকে এই দুর্যোগই সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করছে।

২০১০ সাল থেকেই টানা ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ। তারা বলছে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের বেশি। কিন্তু তার ফলাফল মানুষের জীবনে কোথায়? তাহলে এত এত উন্নয়নের সুফল যাচ্ছে কোথায়? স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, সরকারের এই উন্নয়ন দর্শন বেশিরভাগ মানুষকে ক্রমাগত নিঃস্বকরণের প্রক্রিয়ায় গুটিকয়েক মানুষের হাতে সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করছে। এমন উন্নয়ননীতি দিয়ে আর যাই হোক টেকসই উন্নতি সম্ভব নয়, লুটপাট করার অবারিত সুযোগ তৈরি ছাড়া।

বাসদ (মার্কসবাদী)'র দাবি পক্ষের ডাক

ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন রুখে দাঁড়ান। জনজীবনের সংকট নিরসন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) সারাদেশে দাবিপক্ষ ঘোষণা করেছে। দেশে চলছে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর মূল্য ঊর্ধ্বমুখী। এ অবস্থায় বাসদ (মার্কসবাদী) দীর্ঘস্থায়ী ও ধারাবাহিক গণআন্দোলনের ডাক দিয়েছে। আগামী ৫ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী দাবিসমূহ প্রচার করা হবে। দাবিগুলো হচ্ছে –

১. চালের দাম কমাতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে TCB কে সক্রিয় করতে হবে। আর্মি-পুলিশের রেটে রেশনব্যবস্থা চালু কর। গ্যাস-বিদ্যুতের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার কর।

২. শ্রমিকের ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ১৬০০০ টাকা নির্ধারণ কর, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত কর।

৩. ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত কর। স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ কর। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা দাও।

৪. 'ঘরে ঘরে চাকুরি'র প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। বেকারদের নাম তালিকাভুক্ত করে কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বেকার ভাতা দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় শূণ্যপদে নিয়োগ দাও।

৫. পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা বাতিল কর। প্রশ্নফাঁস ও শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ কর।

৬. চিকিৎসাখাতে ব্যবসা বন্ধ কর। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার অধীনে প্রত্যেক নাগরিকের উপযুক্ত চিকিৎসাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে দোষীদের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও। পর্ণোগ্রাফী, মাদক ও জুয়ার বিস্তার রোধ কর।

৮. দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ কর। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও।

৯. রাষ্ট্রীয় হেফাজতে বিচারবহির্ভূত হত্যা-গুম-ক্রসফায়ার বন্ধ কর। মত প্রকাশের অধিকার হরণ করা চলবে না।

১০. জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই।

পিইসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে গত ২ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে পিইসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টুর পরিচালনায় স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, গবেষক, প্রাবন্ধিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক। বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মোশাহিদা সুলতানা, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডা: জয়দীপ ভট্টাচার্য।

বক্তরা বলেন, শিক্ষার মূলভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। সারা বিশ্বে শিশুশিক্ষাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়, গবেষণা হয় শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে। আর আমাদের দেশে শিশুদেরকে গিনিপিগ বানিয়ে বছর বছর শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়। বিগত দশ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন হয়েছে অনেক। কখনো সৃজনশীল, কখনো ৭টি সৃজনশীল, কখনো বা প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন। ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সরকার প্রাথমিক সমাপনী শিক্ষা (পিইসি) পরীক্ষা চালু করে। ইতোমধ্যেই এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অভিভাবক এবং দেশের শিক্ষিত মহলে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আমরা মনে করি, এই পরীক্ষা শিশুদের মানসিক বিকাশে সহায়তার বদলে শিক্ষাব্যবসার পথকেই ত্বরাণিত করছে। তাই অবিলম্বে পিইসি পরিক্ষা বাতিল করা হোক।'

স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান থেকে আগামী ২২ এপ্রিল '১৮ দেশব্যাপী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এবং ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংগৃহীত স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি পেশ করা হবে।

নোয়াখালীর নবগ্রাম বাজারে বাসদ (মার্কসবাদী)'র অফিস দখলের অপচেষ্টা

নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার নবগ্রাম বাজারের বাসদ (মার্কসবাদী) কার্যালয়ের তালা ভেঙ্গে গত ১৪ জানুয়ারি দখল করে নিয়েছে স্থানীয় যুবলীগ নেতা জহিরুল ইসলাম। তার দাবি, বাসদ (খালেকুজ্জামান)-এর কেন্দ্রীয় নেতা রাজেকুজ্জামান রতনের কাছ থেকে জমিটি নোটারী পাবলিক দলিলের মাধ্যমে সে কিনে নিয়েছে। অথচ, বাজারের সবাই ঘরটিকে বাসদ (মার্কসবাদী)-র অফিস হিসেবে চেনে। এই অফিস এবং অত্র এলাকায় নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বাসদ (মার্কসবাদী) নোয়াখালী জেলার সমন্বয়ক দলিলের রহমান দুলাল। দলিলের রহমান দুলাল ভূমিহীন আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে এই অঞ্চলে পরিচিত। ১৯৯০ সালে সরকারি খাস জমিতে নবগ্রাম বাজার প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাজার কমিটি ঐ জায়গাটি বরাদ্দ দেয়। এই জায়গার উপরে খড়ের ঘর নির্মাণ করে তিনি থাকতেন। ১৯৯৪ সালে ঐ ঘরে তিনি স্কুল চালু করেন। ১৯৯৭ সালে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে তিনি ভিটে বরাদ্দের রশিদ পান। এরপর থেকেই এত বছর ধরে তাঁর নেতৃত্বে ওই অফিসকে কেন্দ্র করে দলের সাংগঠনিক কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে।

গত ১৮ জানুয়ারি নবগ্রাম আঞ্চলিক অফিস দখলের প্রতিবাদে নোয়াখালীর মাইজদীতে মানববন্ধন-সমাবেশ করা হয়। বাসদ (মার্কসবাদী)'র আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ৩০ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় কবিরহাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও কবিরহাট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সরেজমিন তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে যান। অফিসারদ্বয় বাদী, বিবাদী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য শুনেন। এই মর্মে অফিসারদ্বয় সিদ্ধান্ত দেন যে, নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে কোনো জায়গা-জমি ক্রয় বিক্রয় করা যায় না, এটা আইনত অবৈধ। রাজেকুজ্জামান রতন নোটারির মাধ্যমে যে ভিটি বিক্রি করেছে তা আইনত সঠিক নয়। কারণ যেহেতু নবগ্রাম বাজারের জায়গা সরকারি খাস জমি, সেহেতু তার মালিক আইনত জেলা প্রশাসক। অন্যদিকে দলিলের রহমান দুলাল ১৯৯০ সাল থেকে ঘর করে দখলে আছেন। সেহেতু দখল শর্তে তিনি এই ভিটির মালিক। আদালতে দেং ৪৫৭/২০১৩নং মামলা থাকার কারণে এবং বিতর্কিত ভূমি হওয়াতে উক্ত ঘর ও ভিটিটি আদালতের মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মামলা নিস্পত্তি হলে বাজারের ভিটি হিসেবে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে এবং বন্দোবস্ত পাওয়ার ক্ষেত্রে দলিলের রহমান দুলাল এর অগ্রাধিকার থাকবে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কাউন্সিল ও সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন, আবাসন সংকট নিরসন করে সন্ত্রাস-দখলদারিত্বমুক্ত গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস নিশ্চিত করার দাবিতে গত ৬ ফেব্রুয়ারি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত হলো সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১১তম সম্মেলন। উদ্বোধনী র‍্যালির পর বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা ও বাসদ (মার্কসবাদী) 'র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য সাইফুজ্জামান সাকন। সম্মেলনে সালমান সিদ্দিকীকে সভাপতি ও প্রগতি বর্মণ তমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৩ সদস্যের কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম নগর : শিক্ষাব্যবসা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার ৮ম সম্মেলন গত ৭ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক শহীদ মিনারে উদ্বোধন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা। এরপর শিক্ষার বিভিন্ন দাবি নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আরো বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দী। সম্মেলনে আরিফ মঈনুদ্দিনকে সভাপতি ও জয়তু সুশীলকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় ১১ সদস্যের কমিটি। সম্মেলনের শুরুতে ও শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : ট্রাইমিস্টার নয়, সেমিস্টার পদ্ধতি কার্যকর করা ও বছর বছর টিউশন ফি বৃদ্ধি বন্ধ করার দাবিকে সামনে রেখে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য সাইফুজ্জামান সাকন, স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মামুন আল রশিদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার। সম্মেলনে অরূপ দাস শ্যামকে সভাপতি ও অভিমিতা স্বর্ণাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্যের কমিটি পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সম্মেলন শেষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠক নয়, বইয়ের ভালো-মন্দ এখন বিচার করবে পুলিশ!

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মন তৈরি হয়। লেখক লেখেন, প্রকাশক তা বই আকারে প্রকাশ করেন, পাঠক পড়ে মতামত দেন। এটাই একটা গণতান্ত্রিক দেশে মত প্রকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এর কোনোটিই না হয়ে পুলিশের হাতে বই বিচারের ক্ষমতা দিলে তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়?

বলা হচ্ছে নিরাপত্তার কথা। বাংলাদেশের আগেও কখনো ভিন্নচিন্তার লেখক-প্রকাশকদের নিরাপত্তা দেয়া হয়নি। এগুলো কেবল কথার কথা। ২০০৪ সালে প্রথাবিরোধী লেখক হুমায়ূন আজাদকে মেলা প্রাঙ্গণেই কোপানো হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। আজও এর বিচার হয়নি। ২০১৫ সালের বিজ্ঞান লেখক ড. অভিজিৎ রায়কে মেলা প্রাঙ্গণেই খুন করা হয়, তাঁর স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা গুরুতর আহন হন। ওই বছরের অক্টোবরে অভিজিৎ রায়ের বইয়ের প্রকাশক ও জাগৃতি প্রকাশনীর মালিক ফয়সল আরেফিন দীপনকে হত্যা করা হয়। দীপনকে যেদিন হত্যা করা হয় সেদিনই অভিজিৎ রায়ের আরেক প্রকাশনা সংস্থা শুদ্ধস্বরের কর্ণধার আহমেদুর রশীদ চৌধুরী টুটুলসহ তিনজনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। ২০১৫ সালে ইরানের নির্বাসিত লেখক আলী দস্তি রচিত 'নবী মোহাম্মদের ২৩ বছর' বইটি বের করার অপরাধে 'রোদেলা প্রকাশনী'র স্টল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এই সবগুলো ঘটনার সাথে দেশের উগ্রপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো জড়িত ছিল। তাদের ব্যাপারে পুলিশ কিন্তু কিছু করতে পারেনি। প্রগতিশীল ও মুক্তবুদ্ধির লেখক-প্রকাশকদের নিরাপত্তার ন্যূনতম ব্যবস্থা করতে না পারলেও বারবার মৌলবাদী শক্তিগুলোর কথাতেই আইন শৃঙ্খলাবাহিনী ব্যবস্থা নিয়েছে। খোদ প্রধানমন্ত্রীও 'সতর্কভাবে' লেখালেখির কথা বলেছেন।

এদেশে এখন 'ধর্মীয় অনুভূতি' নামক বস্তুটি বড়ই চলতি। কথায় কথায় এই অনুভূতির কথা বলা হয়। এসব কথার পিছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যার কথা বলা হলেও আসলে আড়ালে থাকে শাসকদের স্বার্থ হাসিলের পাঁয়তারা। এমন অপতৎপরতা নতুন নয়। যে বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারও ইতিহাস ঘাঁটলে এমন বিষয় পাওয়া যাবে। ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় বিভাজনের কৃত্রিম বাতাবরণ তৈরি করে ভারত-পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। পাকিস্তান হবার পর 'মুসলিম স্বার্থের' কথা বলে সবকিছুর ইসলামিকরণ শুরু হয়। এমনকি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিও বাদ থাকে না। সেদিন উর্দুকে বলা হয়েছিল মুসলমানের ভাষা আর বাংলা অভিধা পেয়েছিল 'হিন্দু' বা 'বিধর্মী'দের ভাষা বলে। পূর্ববঙ্গের মানুষ শাসকের এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছিল। তাকে প্রত্যাখ্যান করে ভাষার জন্য লড়াই করে সৃষ্টি করেছিল অনন্য এক ইতিহাস। সেই থেকে '২১ শে ফেব্রুয়ারি' আমাদের ভাষা দিবস আর তাকে স্মরণ করে প্রতিবছর মাসব্যাপী পালিত হয় বইমেলা। তাই ভাষা আন্দোলনের চেতনা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে ধর্মনিরেপক্ষতারও লড়াই। বাঙালি জাতির এমন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে আজ ভূলুণ্ঠিত করছে সরকার। মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে আঁতাত করে মানুষের মধ্যে বিভাজনের সেই পুরোনো অস্ত্র 'ধর্মীয় অনুভূতি' কেই ব্যবহার করছে বারবার। মৌলবাদীরা দেশের গণতান্ত্রিক-প্রগতিমনা মানুষদের মধ্যে যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চায়, শাসকরা আইন শৃঙ্খলাবাহিনীকে দিয়ে তাকেই আরও ত্বরান্বিত করছে।

কথায় কথায় ধর্মীয় অনুভূতির কথা বললেও, শাসকদের আর অন্য কোনো অনুভূতি আহত হয় না। প্রতিদিন মানবিকতার কত শত অপমান হচ্ছে, নারী-শিশুরা ধর্ষিত-গণধর্ষিত হচ্ছে, না খেতে পেয়ে পথেই মানুষ মরছে, এক টুকরো কাপড়ের অভাবে শীতে কাঁপছে, খোলা আকাশের নীচে আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের আবাস – এগুলোর কোনোটিতেও শাসকের মানবিক অনুভূতি আহত হয় না। তাদের সব অনুভূতি এক জায়গায় গিয়ে স্থির হয়ে আছে।

আর লেখক-প্রকাশকদের নিরাপত্তা দেবার কথাটাও তো বানোয়াট। প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে, ব্যাংকগুলো থেকে জনগণের কোটি কোটি টাকা লোপাট হচ্ছে, চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুর্নীতিবাজরা কিন্তু আইন শৃঙ্খলাবাহিনী জনগণকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। হত্যা-খুন পরিণত হয়েছে নৈমিত্তিক ব্যাপারে। ক্ষমতাবানদের দখলে দেশের নদী-নালা-খাল-বিল-জায়গা-সম্পত্তি। এসব ক্ষেত্রে অসহায় জনগণ রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাবাহিনীকে পাশে পায় না। সারাদেশের এমন পরিস্থিতিতে তারা লেখক-প্রকাশকদের নিরাপত্তা দেবেন কতটুকু?

নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে। ক্ষমতায় যাবার জন্য শাসক দলগুলোর নানা হিসাব-নিকাশও চলছে। কয়েকদিন আগে হেফাজতে ইসলামের প্রধান আল্লামা শফীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হয়তো তাদের মধ্যে আগামী সময়ের নানা বিষয় নিয়ে কথাও হয়েছে। মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যে এমন বৈঠক দেখলে বোঝা যায় কী দারুণ সখ্যতা। হেফাজতের প্রস্তাবনাতেই তো এ সরকার প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করেছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও কিছু করবে। এবারের বইমেলায় প্রকাশিতব্য প্রায় চার হাজার বই, সবমিলিয়ে লক্ষ লক্ষ বই-ম্যাগাজিন নিয়ে সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কতটুকু নজরদারি করতে পারবে তা হয়তো অনিশ্চিত। কিন্তু হেফাজতে ইসলামের মতো সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর প্রস্তাবনায় বিশেষ বিশেষ বইগুলো সম্পর্কে সরকারের যে সরব ভূমিকা থাকবে তা – বোধহয় বলাই যায়। এখন দেশের প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর দায়িত্ব – তারা এ ব্যাপারটিকে কীভাবে গ্রহণ করবে।

কমরেড হুমায়ূন কবীর লাল সালাম

কমরেড হুমায়ূন কবির বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) পড়ার সময় সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৮৪ সালে তিনি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৮৮ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি মন-প্রাণ ঢেলে সংগঠনের কাজে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। পরবর্তীতে পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে চাকুরিতে যোগ দেন। যখন যেখানে চাকুরি করেছেন, পার্টির সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতেন, ভালো-মন্দ জানতে চাইতেন, সাধ্যমত সহযোগিতার চেষ্টা করতেন। দেশের বাইরে যাবার আগে তিনি দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে উচ্চপদস্থ প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সে সময় পার্বতীপুর, ফুলবাড়ীতে সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা রাখেন। ফুলবাড়ীতে ভূমিরক্ষার আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। এলাকার শ্রমজীবী মানুষের সাথে তাঁর ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। তিনি দিনাজপুর জেলা পার্টিরও সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে দলের অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে দল পরিচালিত হবে কিনা – এ সম্পর্কিত মতবাদিক বিতর্কে তিনি আদর্শিক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তারপর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাসদ (মার্কসবাদী)'র একজন সক্রিয় সমর্থক হিসেবে কাজ করে যান। বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁকে সপরিবারে কানাডায় চলে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকেও তিনি পার্টির সাথে জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করেন। দিনাজপুরের পার্বতীপুরে পারাবারিক সম্পত্তির একটি অংশ 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'র মাধ্যমে পার্টিকে দেয়া যায় কিনা – সে চেষ্টাও তিনি করেন।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি নিবেদিত প্রাণ মানুষ হুমায়ূন কবীর অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। নিরহঙ্কারী এই মানুষটি নিজের জীবনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার অনুশীলন করার চেষ্টা করেছিলেন। কানাডায় থাকাকালীন তাঁর ফুসফুস ক্যান্সার ধরা পড়ে। ক্যান্সারের চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই কমরেড হুমায়ূন কবীর গত ৪ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তাঁর সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

কমরেড হুমায়ূন কবীর – লাল সালাম!

গার্মেন্টস শিল্পে মালিক-শ্রমিকের 'আকাশ পাতাল' পার্থক্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর) তৈরি করে তার, নাকি যে পুঁজি বিনিয়োগ করে তার? কৃতিত্বটা মালিকের নাকি শ্রমিকের?

এই প্রশ্ন শুধু তৈরি পোশাক ক্ষেত্রে নয়, সকল ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের উন্নয়ন, দেশের স্বার্থ বলে অহরহ যা বলা হয় তাতে একটা ফাঁক থাকে। দেশটা কোন অবিভাজ্য দেশ নয়। দেশটা শ্রেণিবিভক্ত। শ্রমিক ও মালিক – এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। তাই দেশের স্বার্থ, দেশের উন্নয়নের কথা উঠলে এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, কার স্বার্থ, কার উন্নয়ন?

একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে কিছু উদাহরণের দিকে তাকালে। গত ২০ জানুয়ারি ১২টি গার্মেন্টস্ শ্রমিক সংগঠন 'গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলন' একটি সংবাদ সম্মেলন করে। গার্মেন্টস শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ১৬০০০ টাকা, ১০% ইনক্রিমেন্ট, স্থায়ীভাবে রেশনিং ব্যবস্থা চালু, ভেরিয়েবল ডিএ, কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড ঘোষণার দাবি করে তারা। বর্তমানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা, যা দিয়ে একটা শ্রমিক পরিবারের জীবন-যাপন অসম্ভব। বেঁচে থাকার জন্য তারা শরীর নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত ওভারটাইম করে। অক্সফামের সাম্প্রতিক রিপোর্টে এসেছে – বিশ্বের প্রধান ৭টি তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশে শ্রমিকদের মজুরি সবচেয়ে কম। বাংলাদেশে বসবাসের জন্য শোভন মজুরি প্রয়োজন ২৫২ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ। অথচ বাংলাদেশে একজন শ্রমিক পান ৫০ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। কোনো কারণে ফ্যাক্টরির লোকসান ঘটলে তার আঘাত সবার আগে এসে পড়ে শ্রমিকদের উপর। আগুনে পুড়ে, ভবন চাপা পড়ে শ্রমিক মারা যায় – তাদের ব্যাপারে রাষ্ট্র কোনো দায়িত্ব নেয় না। তাজরীন গার্মেন্টস, স্পেকট্রাম গার্মেন্টস, রানা প্লাজার ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছে। অথচ মালিকের ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা এমন নয়। ২০১০-২০১৫ এ পাঁচ বছরে গার্মেন্টস মালিকরা সরকার থেকে নগদ সাহায্য পেয়েছে ৪ হাজার ২১৫ কোটি টাকা। ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের রিপোর্ট অনুসারে, ২০০৮ এর পর ২৭০টি গার্মেন্টস এর ঋণ মওকুফ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। রাষ্ট্রীয় ৮ ব্যাংকের মোট খেলাপী ঋণের প্রায় ১৭ শতাংশ আটকে আছে গার্মেন্টস মালিকদের কাছে।

শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর কথা বললে, গার্মেন্টস খাতের নানা সংকট সামনে নিয়ে আসেন মালিকরা। অথচ তাদের নিজেদের জীবনযাপন সেকথা বলে না। খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম 'রয়টার্স' এর প্রতিবেদনে গার্মেন্টস মালিক ফজলুল আজিমের জীবনযাপন উল্লেখ করেছিল। ঢাকায় তার সুইমিং পুলসহ বিলাসবহুল বাড়ি, আরাম-আয়েসে থাকার বিপুল আয়োজন থাকলেও শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর কথা বললে তিনি আমেরিকায় বাজার কমে যাওয়াসহ নানা সংকটের দোহাই দেন। রিপোর্টটিতে একজন মালিককে দেখিয়ে একটা সাধারণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়,এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে ১৮টি প্রতিষ্ঠান ছিল, আয় প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের উপর।

পোশাক শিল্পে মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা না দিলেও কানাডায় গড়ে তুলেছেন 'বেগমপাড়া'। কানাডিয়ান একটি পত্রিকার প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, গার্মেন্টেস মালিকরা দেশে থাকেন, আর তাদের স্ত্রীরা থাকেন কানাডায়। গার্মেন্টস মালিকরা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নাগরিকত্ব নিয়েছেন। মালয়েশিয়া এখন 'সেকেন্ড হোম'। আগুনে পুড়ে শতাধিক গার্মেন্ট কর্মী নিহত হওয়া তাজরীন গার্মেন্টসের মালিক অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। সেখানে রয়েছে তার বেশ কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কোনো গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর চার সদস্যের পরিবারে বিএমডব্লিউসহ মোট গাড়ি রয়েছে সাতটি। কারও ড্রয়িং রুমে রয়েছে আন্ডার গ্রাউন্ড গ্যালারি। কারও বাসায় রয়েছে টেনিস কোর্ট ও সুইমিং পুল। কেউ সিঙ্গাপুরে বাড়ি করেছেন। অথচ তার গ্রুপের তিনটি গার্মেন্টসের প্রায় তিন হাজার শ্রমিক তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ করেছে অসংখ্যবার। 'সিপিডি'র প্রকাশ করা একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দুই বছরে সুইস ব্যাংকসমূহে বাংলাদেশি নাগরিকদের ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। পাচার করা অর্থ দিয়ে খোলা হয়েছে এসব অ্যাকাউন্ট। গত ১৩ বছরে মালয়েশিয়ার 'মাই সেকেন্ড হোম' কর্মসূচিতে ৩ হাজার ৬১ জন বাংলাদেশি অর্থ পাঠিয়েছেন। ওয়াশিংটন ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটির (জিএফআই) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে ৫ হাজার ৫৮৭ কোটি ৬০ লাখ ডলার। টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ হলো ৪ লাখ ৪১ হাজার ৪২০ কোটি টাকারও বেশি। 'লেস ডেভেলপড কান্ট্রিজ (এলডিসি) বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে ছলচাতুরির মাধ্যমে নেওয়া বিভিন্ন সুবিধার অপব্যবহারকারী পোশাকশিল্প মালিকরা এখন অর্থ পাচারের শীর্ষে। তাদের এই অবৈধ কারবার চলছে 'বন্ডেড ওয়্যার হাউজ' বা বন্ড সুবিধার আড়ালে। বন্ড সুবিধায় আমদানি করা শুল্কমুক্ত কাপড় খোলাবাজারে বিক্রির ফলে ধ্বংসের মুখে পড়েছে টেক্সটাইল শিল্প। অনেকের পোশাক কারখানা না থাকার পরও, বন্ড লাইসেন্স নিয়ে আমদানি করা পণ্য খোলাবাজারে বিক্রি করে রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়ার তথ্য মিলেছে ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে। ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের সর্বশেষ তথ্য-উপাত্তে দেখা গেছে, বাস্তবে কোনো ধরনের পোশাক কারখানা না থাকার পরও ৪৭৯টি প্রতিষ্ঠানের নামে আছে বন্ড লাইসেন্স। এসব বন্ড লাইসেন্স ব্যবহার করে পণ্য আমদানি করে খোলাবাজারে বিক্রি করেছেন কালোবাজারের সঙ্গে জড়িত পোশাক শিল্প মালিকরা। এত অনিয়মের পরও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে বিভিন্ন ধরনের কর ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি পোশাক মালিকদের সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা দিয়েছে সরকার।

এ গল্পের যেন শেষ নেই। খালি চোখে বোঝাও যাবে না কীভাবে জীবন চলে এ শিল্পের ৪০ লাখ শ্রমিকের। এ বিরাট বিত্তের পাহাড় যাদের রক্তের উপর তৈরি, ১৬০০০ টাকা মাসিক মজুরি তাদের জন্য কি খুব অতিরিক্ত চাওয়া?

কৈশোরের সারল্য লুটে নিচ্ছে কারা?

(১ম পৃষ্ঠার পর) সেক্টরের ১৭ নম্বর রোডে ট্রাস্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আদনান, ১৬ জানুয়ারি চট্টগ্রাম নগরীর জামালখান এলাকায় কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র আদনান ইসফার বন্ধুদের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়। ঢাকার তেজকুনি পাড়ায় খুন হয় ১৬ বছরের কিশোর, গত ২০ জানুয়ারি খুলনা পাবলিক কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ফাহমিদ তানভির রাজিন ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। খুব অল্পদিনের ব্যবধানে এই ঘটনাগুলো সমাজের এক ভয়াবহ বিপদেরই পূর্বাভাস দিচ্ছে।

আমাদের দেশে এক সময়ে, এই বয়সেই যুদ্ধে গিয়েছিল শহিদ মতিউর, রক্ত দিয়ে ভাষা আনতে গিয়ে শহিদ হয়েছিল রফিক। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর' কবিতাটি তারুণ্যের জয়গানে মুখরিত ছিল। তবে আজ কী হলো? কোথায় সমস্যা? কীসের পরিবর্তন ঘটল? কেন এই বয়সের ছেলেরা মেতে উঠছে খুন-রাহাজানিতে? এই বীভৎস পরিস্থিতি থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে, আমাদের কিশোর-তারুণ্যকে বাঁচাতে হলে, এই সমস্যার মূল খুঁজে বের করতে হবে।

এখন এমন এক অবস্থা সমাজে তৈরি হয়েছে, যেখানে সমস্ত দিক থেকে একটি শিশুকে বঞ্চিত করা হচ্ছে মুক্ত শৈশব থেকে। খেলার মাঠ নেই, শিশু বন্দী ভার্চুয়াল জগতে। মাঠে খেলাধুলা, একসাথে থাকার মধ্য দিয়ে সামাজিকতার যে বীজ রোপিত হয় – তা থেকেই শিশুরা আজ বঞ্চিত। খুব ছোটবেলা থেকেই তাই একাকীত্বের রোগে ভোগে। এর সাথে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে বিভিন্ন পরীক্ষা, অ্যাকাডেমিক ব্যস্ততা। ফলে দেহ-মনে বিকশিত হবার সুযোগ পাচ্ছে না।

এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজ অল্প বয়স থেকেই শিশু-কিশোরের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে কীভাবে কেবল নিজে বড় হওয়া যায়, কীভাবে কেবল নিজে ভালো থাকা যায়। ফলাফলে কৈশোরের কৌতুহলী মনকে মেরে দিয়ে, কিশোর সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে কেবল জিপিএ ৫ পাওয়ার আশায় আশ্রয় হয় গৎবাঁধা, মুখস্থনির্ভর স্কুল আর কোচিং-এর দুয়ারে। এভাবেই রুদ্ধ হচ্ছে মানবিক বিকাশের পথ।

আজকাল স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও ভয়াবহ মাদকের সমস্যায় আক্রান্ত। বস্তুত, মাদক ব্যবসায়ীদের এখন বিরাট ব্যবসার ক্ষেত্র এই স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পর্নোগ্রাফি দেখার অবাধ সুযোগ। এই দুইয়ে মিলে কিশোর বয়সেই জেগে উঠছে পৈশাচিক উন্মাদনা। কিশোর বয়সেই পাশবিক প্রবৃত্তির প্রবল দাপট মানবিক মানুষ হতে বাধা তৈরি করছে।

এভাবে 'নষ্ট' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া চলছে সমাজে। এদের দ্বারা যেকোনো নষ্ট কাজ করা সহজ। সেটিই করছে এলাকার তথাকথিত বড় ভাইয়েরা, যা বিভিন্ন গ্যাং গ্রুপের নেতা বলে পরিচিত। এলাকায় রাজনৈতিক দাপট, প্রভাব-পতিপত্তি দেখানো, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মাদকের ব্যবসা, খুন-ধর্ষণ কী হচ্ছে না এদের দিয়ে! কিশোর বয়সের উচ্ছল সময়গুলোকে এভাবে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগানো হচ্ছে।

উপরে আলোচিত আদনান, ফাহমিদ হত্যাসহ প্রতিটি ঘটনার সাথে এলাকার ক্ষমতাসীনদের সম্পর্ক ছিল। তাদের ছত্রছায়াতে, তাদের ক্ষমতার গুটি হিসেবে কাজ লাগতে গিয়ে কিশোরদের এই পরিণতি হয়েছে। এই অপরাধীদের সম্পর্কে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন অবগত। বহুবার পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে বিষয়গুলো এসেছে। কিন্তু কমছে না কিশোর অপরাধ।

কিশোরদের এই অবক্ষয় থামাতে হলে একদিকে যেমন ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক কিশোরদের স্থানীয় সন্ত্রাসী বানানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে, অন্যদিকে সমাজে ব্যাপকভাবে সংস্কৃতি চর্চা, বড় মনীষীদের জীবনী পালন, মননশীল-সৃজনশীল নানা আয়োজন রাখতে হবে। সমাজের সমস্ত স্তরে মানবিকতা-গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে। একা একা বড় হওয়ার বদলে সকলে মিলে কীভাবে ভালো থাকা যায় – তার শিক্ষা দিতে হবে। তবেই এই ধ্বংসের পথ থেকে শিশু-কিশোরদের নৈতিকতার আলোয় ফিরিয়ে আনা যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নিপীড়ন

(৩য় পৃষ্ঠার পর) ভিসিরা দেখেও দেখান না, জেনেও জানেন না, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একেকটি হল একেকটি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। এদেরই নির্লিপ্ত ও সহযোগী ভূমিকার কারণে শীতের রাতে গেস্টরুমে হাজিরা দিতে গিয়ে নিউমোনিয়ায় মারা যায় ছাত্র। দশ বছর আগে এফ রহমান হলে সিট দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের গোলাগুলিতে মারা যায় মেধাবী ছাত্র আবু বকর। গত কয়েকদিন আগে প্রকাশিত রায়ে দেখা গেল আবু বকর হত্যার জন্য কেউই দোষী সাব্যস্ত হয়নি। রায় যে হয়েছে, তাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানে না। কোন বাবা-মা তার সন্তানের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি মেনে নেবেন?

বিভিন্ন টক শো, লেখালেখিতে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট ও শিক্ষক রাজনীতির সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং কতিপয় সাংবাদিক যেসব প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাতে রীতিমত হবাক হতে হয়। নিতান্ত দলকালা না হলে এরা আন্দোলনের বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে গেটের তালা ভাঙ্গাকেই মূখ্য করে তুলতেন না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যেন জীবনে এই প্রথমবার তালা ভাঙতে দেখেছেন। এদেশের ছাত্রসমাজ তার ন্যায্য দাবিতে কত কতবার ধর্মঘট, অবরোধ করেছে। শুধু তালা ভাঙা কেন, প্রশাসনকে বাধ্য করতে সহিংস হতে হয়েছে – তার ইয়ত্তা নেই। পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক স্বৈরাচার এরশাদ আমলসহ বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রদের আপোষহীন ভূমিকা না থাকলে স্বাধীন দেশ কিংবা স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তি – কোনোটাই মিলত না। অবাক করা বিষয় হলো – এদের মুখে ছাত্রী লাঞ্ছনা কিংবা বর্বরোচিত হামলার জন্য ছাত্রলীগের প্রতি কোনো নিন্দা নেই। সারাদেশে সন্ত্রাস, দখলদারিত্ব, নারী নির্যাতন, মাদক ব্যবসাসহ শিক্ষার পরিবেশ বিপন্ন করার বিরুদ্ধে কোনো উচ্চারণ নেই! ভিসিকে রক্ষার যে হাস্যকর ভাষ্য ছাত্রলীগ তুলে ধরেছে, তাতে এদের কারো মাথায় প্রশ্নের উদয় হয়নি – পুলিশের দায়িত্ব কি ছাত্রলীগকে দেয়া হয়েছে? রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছিলেন, "... ... বুদ্ধিজীবীর রক্তে স্নায়ুতে সচেতন অপরাধ"। বাস্তবিকই বাংলাদেশে আজ বুদ্ধিজীবী শিক্ষকদের বড় অংশই ক্ষমতা ও পদপদবির সুবিধার জন্য নীতি-নৈতিকতা-মনুষ্যত্ববোধ সবকিছুকেই বিকিয়ে দিচ্ছেন।

চিত্রিত করার সেই পুরোনো কায়দা

বহু প্রত্যাশিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যখন চলছিল, সেসময় সরকারের যেকোনো গণবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করলে একটি কথাই বলা হতো – 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে বানচাল করার জন্যই এসব করা হচ্ছে'। সবক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন পদাধিকারীদের একই কৌশল! ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কখনো বলা হচ্ছে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির এরা আন্দোলনে ছিল। আবার কতিপয় শিক্ষকরা উচ্চারণ করছেন সেই চিরায়ত বাণী – 'একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করতে চায়', 'সরকারকে নাজুক অবস্থায় ফেলতে চায়' ইত্যাদি। গন্ধশোঁকার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণীদের রিফ্লেক্সে বাইরে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য থাকবার উপায় নেই। কিন্তু এদের উদ্দেশ্য কপট। প্রকারন্তরে এরা ছাত্রলীগের আধিপত্যবাদী মানসিকতাকেই লালন করেন, তাকেই বজায় রাখতে সহায়তা করেন। এদের যেমন ছাত্রলীগের দরকার তেমনি ছাত্রলীগেরও অভিভাবকত্ব প্রয়োজন। এরকম শিক্ষকদের অ্যাকাডেমিক পাঠদানের ভিতর দিয়ে কীভাবে একজন ছাত্র প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে – এ এক বড় প্রশ্ন। সচেতন মানুষকে আজ এটি ভাবতে হবে।

আশা কোথায় তাহলে?

অন্ধকার যখন বড় হয়ে থাকে ভেতরের ছোট্ট আলোটি অনেক সময় দৃশ্যমান হয় না। ক্ষমতার মদমত্ততা, সুবিধাবাদের ধারা *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

যারা দিল সবই, পেল না কিছুই

(১ম পৃষ্ঠার পর) বলতে শাক-আলুভর্তা, এক ফালি মিষ্টি কুমড়া দিয়েই সারতে হয়। এরপর শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কেবলই ভাবনা সুঁই-সুতা, প্রোডাকশন আর প্রোডাকশন। এত কিছুর পরও মাসের অর্ধেক ফুরাবার আগেই মজুরি শেষ। সে ভুলেই যায় – সে একজন মানুষ, তারও একটা মন আছে, সে কারো না কারো মেয়ে-বোন। এই সাবিনা হলো দেশের প্রধান শিল্পখাত গার্মেন্টস শিল্পের একজন অধিকারবঞ্চিত শ্রমিক।

বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে চেনবার অনেকগুলো মাধ্যমের একটি হলো পোশাক শিল্প। বাংলাদেশের তৈরিকৃত পোশাক ব্যবহৃত হয় না - এমন দেশ কম-ই আছে। এই শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ আয় করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা। শাসকদের অহংকার ডলারের বিশাল রিজার্ভ এ খাতের অবদান। বাণিজ্যিক ঘাটতি কমিয়ে আনতে প্রধান ভূমিকা রাখছে এ শিল্পখাত। পাহাড়সম আমদানি ব্যয়ও মিটিয়ে চলছে গার্মেন্টস শিল্পের আয়। এত সব বড় বড় অর্জনের পিছনে ৪০ লক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিকের প্রধান ভূমিকা। স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে অভূতপূর্ব রপ্তানি আয়ের গৌরবে শাসকদের নামে জয়ধ্বনি দেয়া হলেও কোথাও এতটুকু আলোচনা নেই – কেমন আছে গার্মেন্টস শ্রমিকরা, কী খায় তারা, কী রকম বাসস্থানে তারা থাকে , স্বাস্থ্য সেবা কতটুকু পায়, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কতটুক? রাষ্ট্র-সরকার, প্রধান রাজনৈতিক শক্তি কারো এসব প্রশ্নে কোনো আগ্রহ নেই।

বিগত অর্থবছরে গার্মেন্টস শিল্প আয় করেছে প্রায় ২ হাজার ৮১৫ কোটি ডলার। ইউরোপ-আমেরিকার প্রধান প্রধান দেশগুলোর বাইরে এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার অনেক নতুন মার্কেটেও বাংলাদেশ অর্ডার সরবরাহ করছে। বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে, উৎপাদন ও মালিকের মুনাফা বাড়ছে, বাড়ছে না শ্রমিকের মজুরি। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ২০১৩ সালের পরে বাজারের সকল পণ্যের মূল্য ৩০ ভাগ করে বেড়ে গেছে। কিন্তু সত্যি হলো, শ্রমিক এলাকাগুলোতে এ হার ৪০ ভাগ। প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে নির্ধারিত মজুরিতে কিভাবে বাঁচছেন শ্রমিকরা। মালিকরা মজুরি বৃদ্ধির কথা শুনলেই লোকসানের অজুহাত তোলে। অথচ ২০১৩ সালের পরে বাংলাদেশে তৈরি সকল গার্মেন্টস পণ্যের দাম বিশ্ববাজারে বেড়েছে। তৎকালীন সময় মজুরি বাড়ার ফলে মালিকের ক্ষতি হয়নি, বরং মুনাফার হার বেড়েছিল। মজুরি বাড়ার কয়েক মাসের মধ্যেই সারাদেশের কারখানাগুলোতে হয়েছে ব্যাপক ছাঁটাই। সেই থেকে ৩ জনের কাজ একজন শ্রমিকের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। শ্রমিকের কাঁধে অতিরিক্ত খাটুনির বোঝা- ঘন্টা প্রতি প্রোডাকশন টার্গেট ৪০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে। মালিকরা সর্বদা মজুরি বাড়ানোর বিরুদ্ধে দুটি অপপ্রচার চালায় 'অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, ক্রেতারা বাংলাদেশে আর অর্ডার দেবে না'। কিন্তু বাস্তব চিত্র হল এই যে, সক্ষমতার দিক থেকে এগিয়ে থাকা দেশগুলোতে মজুরির হার বাংলাদেশের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও দ্বিগুণ মজুরি দিচ্ছে। এ শিল্পে এক ঘন্টা শ্রম দিয়ে শ্রমিকরা মালিকের জন্য যে পরিমাণ মুনাফা সৃষ্টি করে তা অন্য যে কোন শিল্পখাতের চেয়ে বেশি। শ্রমিকের সৃষ্ট বড় অংকের মুনাফা থেকে মালিকরা কেন শ্রমিকদের বাঁচার মতো মজুরি দিবে না? শহর এলাকায় পাড়ার মোড়ে ছোট্ট রেষ্টুরেন্টের শ্রমিকের পিছনে মালিক থাকা-খাওয়া, মজুরি বাবদ ৬ হাজার টাকার বেশি খরচ করে। সেখানে কেন গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকের মজুরি ৫৩০০ টাকা হবে (ইপিজেডে ৫৬০০ টাকা)?

মালিকরা যুক্তি দেখায় একজন শ্রমিক উক্ত বেতন কাঠামোয় মাস শেষে ৮ হাজার টাকার অধিক বেতন পায়। কিন্তু সেটা ৮ ঘন্টায় মজুরি নয়, প্রতিদিন ৪ ঘন্টা করে ওভার টাইম ডিউটির মজুরি। আর প্রতিবার ঘোষিত মজুরি কাঠামোর সুফল পায় নতুন নিযুক্ত শ্রমিকরা। পুরনো শ্রমিকের বেতন বাড়ে খুব সামান্যই। বাস্তব চিত্র এমন, ১৩ বছর ধরে কাজ করা শ্রমিক পায় সাড়ে ১২ হাজার টাকা। আর তিন বছর ধরে কাজ করা শ্রমিক পায় ১১ হাজার টাকা মজুরি। এটাই হল মজুরি কাঠামোর শুভঙ্করের ফাঁকি! প্রত্যেক গ্রেডে বর্তমান মজুরি থেকে শতকরা হিসেবে মজুরি বৃদ্ধি হলে তার সুফল পোশাক শিল্প শ্রমিকরা পেত। সম্প্রতি মজুরি বোর্ড গঠিত হয়েছে। শ্রমিকদের আশঙ্কা এবারও তাদের ঠকানো হবে। একজন গার্মেন্টস শ্রমিকের শারীরিক পরিশ্রমের বিবেচনায় দৈনিক ২৬০০ কিলোক্যালরি সুষম খাবার গ্রহণ জরুরি। কিন্তু বিদ্যমান মজুরিতে প্রায় দ্বিগুণ মূল্যস্ফীতিতে বাসা ভাড়া, পরিবহন খরচ, চিকিৎসা-শিক্ষাসহ নানা পারিবারিক ব্যয় মিটিয়ে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ কি সম্ভব? আজকের বাজারে পরিস্থিতিতে ১৬ হাজার টাকার নীচে ৪ জনের পরিবারের সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

নাগরিকের মতপ্রকাশের, সংগঠিত হওয়ার, ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার সংবিধানে সংরক্ষিত আছে। আইএলও কনভেনশনের এ সংক্রান্ত ঘোষণা শাসক শ্রেণিও স্বীকার করে, কিন্তু ৪০ লক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিককে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। দেশের জাতীয় ও স্থানীয় সকল প্রতিনিধি নির্বাচনে শ্রমিকরা ভোট দিতে পারলেও নিজেদের পেশায় ও কারখানায় প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না। ইপিজেডে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন আইনত নিষিদ্ধ। তথাকথিত শ্রমিক কল্যাণ সমিতির বিধান আছে, তবে হাতে গোনা কয়েকটি কারখানা ছাড়া কোথাও নির্বাচন হয় না। সেই নির্বাচনে ম্যানেজমেন্টের পছন্দ অনুযায়ী প্রতিনিধি বেছে নিতে হয়। শ্রম আইনে ইপিজেডের বাইরের কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধান আছে কিন্তু শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও মালিকের যোগসাজশে এই উদ্যোগ শুরুতেই ধ্বংস করা হয় এবং উদ্যোগী শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হয়। কারখানায় কারখানায় কাজের অতিরিক্ত চাপ, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম, ছুটি ও বোনাসের টাকা না দেয়া, মজুরিহীন অতিরিক্ত খাটুনি, কথায় কথায় অন্যায়ভাবে ছাঁটাই, শারীরিক নির্যাতন, নিয়োগ- পদোন্নতিতে অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের চাপা ক্ষোভ বিরাজ করে। মাঝে মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ফেটে পড়লেও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার না থাকায় এত বড় একটি শিল্পখাতের শ্রমিকরা পুরোপুরি অসংগঠিত। কারখানাভিত্তিক সংকট নিরসনে ও পেশাগত জাতীয় যথার্থ দাবি তুলে ধরার প্রতিনিধির অভাবে মালিক-সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জোরদার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠছে না, আর অবহেলা-বঞ্চনারও অবসান হচ্ছে না।

দেশে এখনো যতটুকু রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা আছে সেখানে তুলনামূলক ভালো মজুরি, ডরমেটরির ব্যবস্থা, পরিবহন সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং পেনশন সুবিধা আছে। আশির দশকে এরকম শত শত কারখানা বন্ধ করে দিয়ে লাখ লাখ শ্রমিককে বেকার করা হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকশিত না হয়ে গ্রামভিত্তিক কর্মসংস্থানের পথকে সংকুচিত করা হলো। বেকারের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে, শ্রমবাজারকে পরিকল্পিতভাবে সস্তা করা হয়েছে। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে গ্রামের সকল কর্মক্ষম লোককে কৃষিপেশায় ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়া পেশা হিসাবে কৃষি দিন দিন অলাভজনক হওয়ায় গরীব-মাঝারি কৃষককে পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় পরিবারকে সহযোগিতা করা ও দু'মুঠো খেয়ে কোনো মতে জীবন ধারণ করার প্রয়োজনে কারখানাগুলোতে কাজ নিয়েছে নারী শ্রমিকরা। এরাই গার্মেন্টস শিল্পের শতকরা ৭০ ভাগ। কিন্তু কী নির্মম পরিহাস! শাসকরা নারীর ক্ষমতায়নের ধুয়া তুললেও এ নারীরাই সবেতনে চারমাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি পায় না। গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের নানা অজুহাতে ছাঁটাই করা হয়। যেখানে নেপালের মত পিছিয়ে পড়া দেশেও নারী শ্রমিকদের জন্য প্রতি মাসে পিরিয়ডকালীন দুই দিন ছুটির বিধান রয়েছে, সেখানে দেশের ৯০ ভাগ কারখানা শ্রম আইনও মানে না। অর্থনীতির চালিকা শক্তি এই নারীদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ। অতিরিক্ত খাটুনি ও অপুষ্টির স্বীকার হয়ে বয়স ৩৫ হওয়ার আগেই বুড়িয়ে যাওয়া, কিডনি রোগ, মেরুদণ্ড ক্ষয়সহ নানা জটিল রোগে তারা ভুগে। এই নারী শ্রমিকদের মধ্যে বাড়ছে বন্ধ্যাত্বের হারও। শ্রমিক এলাকাগুলোতে এই নারী শ্রমিকদের জন্য নেই পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ। শ্রমিক এলাকাগুলোতে সরকারি হাসপাতালের দাবি বারবার উপেক্ষা করা হয়েছে। এই শ্রমিকদের বেতনের বড় অংশ ব্যয় হয় বাসা ভাড়ায়। শ্রমিক অঞ্চলে বাসা ভাড়ার হার অন্য এলাকাগুলোর প্রায় দ্বিগুণ। প্রতি বছর রুম প্রতি ২০০ থেকে ৫০০ টাকা করে বাড়ে। ১টি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা গার্মেন্টস কারখানার চেয়ে কম মুনাফা করে শ্রমিকদের জন্য ডরমেটরির ব্যবস্থা করতে পারলে সেক্ষেত্রে গার্মেন্টস মালিকরা কেন শ্রমিকদের জন্য কলোনি নির্মাণ করবে না? রেশনিং সুবিধাও এখন সময়ের দাবি। সরকারের সামরিক-আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা কোনোরকম উৎপাদন কাজে অংশ না নিয়ে বড় অংকের বেতন পাওয়া সত্ত্বেও রেশনিং সুবিধা পেলে গার্মেন্টস শ্রমিকরা কেন রেশন পাবে না এই প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।

সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি-রপ্তানি আয় ছুটছে সমান তালে। মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে নাকি আর বেশি দেরি নেই। সত্যি এ কি উন্নয়ন! দেশের প্রধান শিল্পখাতের বিশাল সংখ্যক শ্রমিক যখন অধিকার বঞ্চিত থাকে। আর কত দিন এই তথাকথিত উন্নয়নের নিচে চাপা পড়ে থাকবে গার্মেন্টস শ্রমিকের হাহাকার।

আমেরিকার 'উন্নত' জীবনের স্বপ্ন ধূসর হচ্ছে ক্রমশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সারা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশের তকমা এখনও আমেরিকার আছে। কিন্তু বুঝতে হবে এই তকমা সে কীভাবে পেল। পৃথিবীর প্রথম দশজন ধনকুবেরের মধ্যে তো অর্ধেকেরই বেশি আমেরিকান। পৃথিবীর ৫০ ভাগেরও বেশি সম্পদ মাত্র ৮ জন পুঁজিপতির হাতে – অক্সফাম কর্তৃক প্রকাশিত এ তথ্যের সেই ৮ জন পুঁজিপতির বেশিরভাগই আমেরিকান। কিন্তু আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা কী?

প্রদীপের নীচে যেমন অন্ধকার থাকে তেমনি অবস্থা আমেরিকাতেও। সেখানে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার অধিকার সংকুচিত হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবন হয়ে উঠছে দুর্বিষহ। একটি ছোট উদাহরণ দেয়া যাক, আমেরিকায় শ্রমজীবী মানুষদের কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য 'ফুড স্ট্যাম্প' দিয়ে খাবার সংগ্রহ করার সুযোগ আছে। শ্রমিকদের বেতন থেকে কেটে (৬ ডলার কাটা হয়) সরকার এ ব্যবস্থা করে। সামান্য এই অধিকারটুকুও সরকার এখন ছেঁটে ফেলতে চাইছে। বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ব্যবস্থা তারা বাতিল করবে। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ফিলিপ অ্যাস্টন বিশ্বখ্যাত ওয়ালমার্ট কোম্পানির একজন শ্রমিকের সাথে কথা বলেছেন। তিনি জেনেছেন, ওই শ্রমিক যে বেতন পান তাতে কোনোভাবেই তার বেঁচে থাকা সম্ভব নয় যদি না 'ফুড স্ট্যাম্প'র এই সুবিধা থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে ন্যূনতম মজুরির দাবি বারবার উঠেছে কিন্তু সরকার কেনো কর্ণপাত করেনি।

এবারে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতার আসার আগে একটি স্লোগান তুলেছিলেন, 'Make America Great Again' অর্থাৎ আমেরিকাকে আবারও সর্বশ্রেষ্ঠরূপে গড়ে তোল। ট্রাম্পের এ ঘোষণা আমেরিকার সমস্ত জনগণের উদ্দেশ্যে ছিল না, ছিল স্বল্প কিছু বড়লোকদের জন্য। এটা বোঝা যায় যখন ক্ষমতায় এসেই ট্রাম্প বড়লোকদের ট্যাক্স ছেঁটে ফেলে, অথচ জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে বাজেট কমিয়ে দেয়। পৃথিবীব্যাপী অস্ত্রব্যবসা, পর্নোব্যবসা, সফটওয়ার বাণিজ্য করে আমেরিকান পুঁজিপতিরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করে। আমেরিকায় যে পরিমাণ সম্পদ আছে তার সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় এখন অস্ত্র কেনা-বেচা খাতে। এই অস্ত্র কেনা-বেচা করেই আমেরিকার অর্থনীতি টিকে আছে। পুঁজিপতিরা অস্ত্র উৎপাদন করে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ বরাদ্দ করে এ অস্ত্র কেনা হয়। এই ব্যয় সম্মিলিতভাবে চীন, সৌদি আরব, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ভারত, ফ্রান্স এবং জাপানের মোট ব্যয়ের সমান।

অথচ একই সাথে আমেরিকার সরকার শ্রমিকের কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য 'ফুড স্ট্যাম্প'র অধিকার কেড়ে নেয়। এ সমস্যা আজ আমেরিকায় তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সংকটের সূচনা আজকের নয়। একই রকম সিদ্ধান্ত ওবামা, তার আগে বুশ কিংবা ক্লিনটন প্রত্যেকেই নিয়েছিল। ডেমোক্র্যাট কিংবা রিপাবলিক ক্ষমতায় যেই আসুক, দৃশ্যপটের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পার্থক্য কেবল এতটুকুই– আজ কোনো কিছু দিয়েই তথাকথিত উন্নত আমেরিকার কদাকার ছবিটা আর আড়াল করা যাচ্ছে না। ধনী-গরীবের মধ্যে যে প্রবল বৈষম্য তা এখন সাদা চোখেই দৃশ্যমান হচ্ছে।

বহুদিন আগে সর্বহারার মহান নেতা কার্ল মার্কস শ্রমিকশ্রেণির লড়াইকে শাণিত করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'সর্বহারা শ্রেণির শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছু নেই।' আজ আমেরিকার শ্রমজীবী-নিপীড়িত মানুষকেও এ সত্য উপলব্ধি করে এগিয়ে আসতে হবে। যে 'গ্রেট আমেরিকান'র কথা শাসকরা বলে, যে আমেরিকার জীবনস্বপ্নের কথা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হয় – তা একটি মোহ মাত্র। এই শৃঙ্খল থেকে বেড়িয়ে এসে সংগঠিতভাবে পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।

দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, বাড়ছে জীবনযাত্রার ব্যয়

মূল্যস্ফীতির যাঁতাকলে পিষ্ট দেশবাসী

প্রায় বছরখানেক ধরে সবধরনের চালের দাম স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। মোটা চালের দাম ৫০ টাকার উপরে। এমনকি চালের ভাঙা অংশ, যা খুদ নামে পরিচিত, তারও কেজি ৫০ টাকা। মানুষের প্রধান খাদ্য চাল কিনতে নাভিশ্বাস উঠেছে নিম্ন আয়ের মানুষের। চালের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে বাড়তে দামের সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে পেঁয়াজ। খানিকটা কমলেও এখনও বাজারে ৭০/৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ। ভরা মৌসুমে কোনো সবজিই মিলছে না ৫০ টাকার নীচে। এক কথায় প্রধান প্রধান খাদ্য পণ্যের দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

ঢাকাসহ শহুরে মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে বছরের শুরুতে বাসা ভাড়ার লাগামহীন বৃদ্ধিতে। এমনকি মোটর সাইকেল ও গাড়ি রাখার গ্যারেজ ভাড়াও বাড়িয়েছে মালিকরা। জীবনযাত্রার ব্যয়ে ও পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে জনগণ গুমড়ে কাঁদলেও সরকারের মূল্যস্ফীতির খতিয়ানে সেই চিত্রের দেখা মিলছে না। বরং বাজারের ঠিক উল্টো চিত্র মূল্যস্ফীতির সূচকে। বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য উপাত্তের।

সাধারণভাবে মূল্যস্ফীতি দুইভাবে পরিমাপ করা হয়। একটা হচ্ছে খাদ্য মূল্যস্ফীতি – যেখানে চাল, তেল, আটা, পেঁয়াজ, মাছ-মাংসসহ ৪০টির বেশি খাদ্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির হিসাব করা হয়। খাদ্য মূল্যস্ফীতির সব পণ্যের মধ্যে চালের অবদান বেশি, যা পরিসংখ্যানের ভাষায় 'ওয়েট' নামে পরিচিত। আরেকট হলো খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বা নন ফুড ইনফ্লেশন। যেখানে বিবেচনায় নেয়া হয় পোশাক, বাড়ি ভাড়া, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও পরিবহন খরচ। খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত দুটোর গড় করে মূল্যস্ফীতি হিসাব করা হয়। গেল এক বছরে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়লেও মূল্যস্ফীতি ঘুরে ফিরে ৫ দশমিক ৬ ভাগের মধ্যেই আটকে ছিল। কিন্তু সব কিছুর মূল্যবৃদ্ধির পরও কেন মূল্যস্ফীতি সূচকে তেমন কোনো হেরফের হয়নি? এখানে ফাঁকিটা হলো বিবিএসের হিসেবে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি আগের তুলনায় অর্ধেকের কম দেখানো হয়েছে। একইভাবে পোশাক, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের খরচ বৃদ্ধির হারও কমিয়ে দেখানো হয়েছে। আমাদের আলোচনায় দেখা যাবে কীভাবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতিতে সাধারণ মানুষকে দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্রের কাতারে নিয়ে যাচ্ছে।

মূল্যস্ফীতির প্রভাব পড়ে পুরো অর্থনীতিতে, বাড়তি চাপ পড়ে সব শ্রেণির মানুষের উপর। মানুষের পণ্য সামগ্রী কেনার ক্ষমতা কমে যায়। ধরা যাক, বর্তমান মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশ, অর্থাৎ আগে যে পণ্যটির দাম ছিল ১০০ টাকা, সেই পণ্যটি এখন কিনতে হবে ১১০ টাকায়। একই পরিমাণ টাকা দিয়ে আগের চেয়ে কম জিনিস কিনতে হবে। বিপরীতে সবার আয় তো আর সমানভাবে বাড়ে না। কিন্তু মূল্যস্ফীতির প্রভাব পড়ে সমানভাবে। এতে করে, বেশি বিপাকে পড়তে হয় ধরাবাঁধা আয়ের মানুষকে। সংসার চালাতে সঞ্চয় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সাধারণ মানুষ। মূল্যস্ফীতির কারণে পরিবহনসহ সব ধরনের সেবা পেতেই গুণতে হয় বাড়তি টাকা। ফলে সঞ্চয় যখন থাকে না, তখন পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা বা শিক্ষার খরচ অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে আর কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। বাধ্য হয়ে তাদের ধার দেনা করে বাড়তি খরচ মেটাতে হয়। আর ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করার বিকল্প থাকে না। এভাবেই বছরের পর বছর ধরে জায়গা-জমি বিক্রি করতে করতে ভূমিহীন হচ্ছে সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে বেশির ভাগ সম্পদ ক্রমান্বয়ে চলে যাচ্ছে অল্প সংখ্যক ধনীদের কাছে। ফলে মূল্যস্ফীতির দীর্ঘমেয়াদী পরোক্ষ প্রভাব আছে জাতীয় জীবনে।

বর্তমান সরকারের টানা দুই মেয়াদে উন্নয়নে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার কথা হরদম বলছেন মন্ত্রী-এমপিরা। তারপরও দেশের মোট জনগোষ্ঠীর সাড়ে ১২ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। অর্থাৎ ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে আড়াই কোটি মানুষই অতি দরিদ্র, যাদের দৈনিক রোজগার গড়ে ১০০ টাকার কম। এই বছরে আরও বেশি মানুষ যোগ দেবে হতদরিদ্রের তালিকায়। এ বছরের ভয়াবহ বন্যায় চোখের নিমেষে সহায়-সম্বল সবকিছু হারিয়ে পথে বসেছেন সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজারসহ হাওর অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ। একইভাবে দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধাসহ উত্তরের প্রায় ৮ জেলার মানুষও এ বন্যায় ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

বন্যার ধকল কাটতে না কাটতে মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে আঘাত হেনেছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা নামতে *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

আমেরিকার 'উন্নত' জীবনের স্বপ্ন ধূসর হচ্ছে ক্রমশ

গত বছরের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের অতিদারিদ্র্য ও মানবাধিকার বিশেষক বিশেষ র‍্যাপর্টিয়ার (Rapporteur) প্রফেসর ফিলিপ অ্যাস্টন একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১৫টি অঞ্চলে যেখানে দরিদ্র মানুষের বসবাস, সেগুলোতে ঘুরে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিলেন। অ্যালাবামা, ক্যালিফোর্নিয়া, পূর্ব ভার্জিনিয়া, টেক্সাস, ওয়াশিংটন ডিসি, পোয়ের্ত রিকা- এসব জায়গায় ঘুরে যে বর্ণনা তিনি দিলেন তা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রধান সারির মিডিয়া প্রকাশ করেনি। ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। এর আগেও আমরা দেখেছি ইরাক-আফগানিস্তানে যুদ্ধ বাধানোর জন্য মিডিয়াকে দিয়ে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়েছিল। মিডিয়া কার স্বার্থকে রক্ষা করে, তা তো বোঝাই যায়।

প্রফেসর ফিলিপ অ্যাস্টন, যিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক, তাঁর বর্ণনায় আমরা বর্তমান আমেরিকার কিছু বাস্তবচিত্র দেখব। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে লিখছেন, 'লস এঞ্জেলসে মাদকাসক্ত এমন অনেকের সাথে আমার দেখা হলো যারা কোনো রকমে বেঁচে আছে। সান ফ্রান্সিসকোতে দেখলাম একজন পুলিশ অফিসার গৃহহীন কিছু মানুষকে রাস্তা থেকে চলে যেতে বলছে। তারা যখন জিজ্ঞাসা করছে কোথায় যাবো, পুলিশ অফিসার তখন নিরুত্তর রইল। আমি দেখেছি বহু অঞ্চলের নালা-নর্দমা ময়লায় পরিপূর্ণ। এগুলো পরিষ্কার করার দায়িত্ব সরকারের থাকলেও তারা তা করছে না। আমি দেখেছি, বিভিন্ন অঞ্চলে গরীব মানুষরা তাদের সবগুলো দাঁত হারিয়েছে। কেননা সরকার তাদের 'দাঁতের সুরক্ষায়' কোনো চিকিৎসা সেবা দেয়নি। আমি পরিবারগুলোতে চিকিৎসা সেবার অপর্যাপ্ততা ও মাদকাসক্তির কারণে ক্রমবর্ধমান মৃত্যুহারের কথা শুনেছি। আমি দক্ষিণ পোয়ের্ত রিকায় এমন কিছু মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি যারা পাহাড়ের কয়লাখনির কাছে সম্পূর্ণ অনিরাপদ অবস্থায় বসবাস করে। কয়লাখনি থেকে প্রবাহিত ছাই তাদের মারত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলেছে, বাড়ছে অসুস্থতা, বিকলাঙ্গতা এবং মৃত্যু।'

ফিলিপ অ্যাস্টনের এই বর্ণনা আমেরিকা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। যে আমেরিকা গণতন্ত্রের বড়াই করে, উন্নত জীবনের স্বপ্ন ফেরি করে দুনিয়া ব্যাপী – তার এই অবস্থা? অ্যাস্টনের বক্তব্য এতটুকুতে শেষ হয়নি। তিনি বলছেন, '২০১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুহার ছিল উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধনী-গরীব বৈষম্যের হার অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে 'জিকা' রোগটি এখন বেশ প্রচলিত। ২০১৭ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে কৃমিজাতীয় রোগ গরীব মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। স্থূলতার সমস্যা অন্যান্য দেশের মধ্যে আমেরিকায় সর্বোচ্চ। পানি ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ব্যবস্থায় আমেরিকা পৃথিবীর ৩৬ তম। কারারুদ্ধ মানুষের সংখ্যা আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি। প্রায় ১৯ মিলিয়ন মানুষ ভয়াবহ দারিদ্রসীমার মধ্যে বাস করছে। ইউনিসেফ'র মতে ১৫টি উচ্চ ধনী দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিশু দারিদ্র্য সর্বোচ্চ। অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিক্স বলছে আমেরিকার অর্ধেকেরও বেশি শিশু অপুষ্টির ঝুঁকিতে আছে। এককথায় গড় মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার, মাতৃমৃত্যুহার, স্থূলতার হার, পুষ্টিহীনতা, শিক্ষিত হবার হার, শিশু দারিদ্র্য, গৃহহীন মানুষের সংখ্যা, আয় বৈষম্য, আত্মহত্যার হার ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'মৌলিক অধিকার পরিমাপক' এ যুক্তরাষ্ট্র অনেক পিছিয়ে।'

উপরোক্ত তথ্যগুলো আমেরিকার প্রধান সাড়ির মিডিয়াগুলো কেন প্রচার করেনি – তা খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে। তবে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই যে – আমেরিকায় কেবল দরিদ্র মানুষেরও বসবাস। *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

পাঠক নয়, বইয়ের ভালো-মন্দ এখন বিচার করবে পুলিশ!

পাঠক নয়, বইয়ের ভালো-মন্দ এখন বিচার করবে পুলিশ! কথাটা বিস্ময়কর হলেও সত্য। এবারের বইমেলা শুরুর সময়ে ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার এমনটাই বলেছেন। ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ থেকে শুরু হওয়া বই মেলায় তারা নজরদারি করবে। আসলে দেখবে কোনো বই 'ধর্মীয় অনুভূতি'তে আঘাত হানছে কিনা। লেখক-প্রকাশকদের নিরাপত্তার জন্যই নাকি তারা এ কাজটি করছে।

প্রথমেই যে প্রশ্নটি আসে, বইয়ের ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা পুলিশকে কে দিয়েছে? পুলিশের কি এমন এখতিয়ার আছে নাকি থাকা উচিত? কোনো একটি বই যদি অশ্লীল হয়, মানুষের মানবিক অনুভূতিকে আঘাত করে, বইয়ে যদি সমাজবিরোধী উপাদান থাকে – তাহলে তা পাঠকসমাজ বর্জন করবে। প্রয়োজনে প্রতিবাদ করবে। লেখা দিয়ে লেখার প্রতিবাদ হবে। এভাবেই তো গণতান্ত্রিক মত ও পথের সৃষ্টি হয়। মানুষ বিষয়ের সঠিকতা-বেঠিকতা বুঝতে পারে, একটা যুক্তিবাদী (৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

গার্মেন্টস শিল্পে মালিক-শ্রমিকের 'আকাশ পাতাল' পার্থক্য

বরাবরের মতোই দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। দেশে এখন ৫০ হাজার কোটিপতি। দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে ৪ কোটিরও বেশি মানুষ। শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশি লোক একবেলা খেতে পারে না। এর মধ্যেও সরকার দেশের উন্নয়নের ঢোল যখন বিরাট আড়ম্বরে বাজাতে থাকেন, সেই রণবাদ্যে সবার আগে বেজে ওঠে গার্মেন্টস খাত।

দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কী দিয়ে বুঝব? আমাদের গার্মেন্টস খাত এরই মধ্যে একবার রপ্তানিতে চীনকেও অতিক্রম করেছে। ২০২১ সালে পোশাক রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন এ শিল্পের উদ্যোক্তারা। পোশাক শিল্পে দেশ সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, বিশ্বের বড় বড় ব্র্যান্ডের পোশাক তৈরি হচ্ছে এখানে – এ আমাদের গৌরব। দেশের উন্নয়ন। সরকারের ক্রেডিট।

তাই এ খাতকে টিকিয়ে রাখতে হবে একথা যখন বলা হয় তখন কেউই এতে না করার কোনো কারণ খুঁজে পান না। কিন্তু পোশাক খাতের গৌরবের কৃতিত্ব কার? যে ঘাম ঝরিয়ে এই পোশাক *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org